মাদারে মিল্লাত

মাদারে মিল্লাত

হাকীম আবদুল মান্নান

লতীফ বুক করপোরেশন
৬৩, পাটুয়াটুলী, ঢাকা—১

প্রকাশক :
গোলাম রব্বানী, বি. কম.
লতীফ বুক করপোরেশন
৬৩, পাটুয়াটুলী, ঢাকা—১
ফোন : ৪২৯৯১/২৫৪

প্রাপ্তিস্থান :
হামিদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা—১
ফোন : ৪৪৪০৮

প্রকাশকাল :
১লা জুলাই, ১৯৬৫

মুদ্রণ :
দি ষ্টার প্রেস
২১/১, শেখ সাহেব বাজার রোড
ঢাকা—১

ছবি মুদ্রণ :
নওবেলাল প্রিন্টিং প্রেস
৩, নয়া পল্টন, ঢাকা—২

জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস লেন, ঢাকা
১—৫ ফর্মা।
মূল্য পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

বুক ভরা ব্যথার নিদারুণ বোঝা নিয়ে
স্মরণ করি
সেই সব
ছোট্ট কচি শিশু মাসুমদের কথা
মা-বোনদের কথা
বীর বাহাদুর মোজাহিদগণের কথা
যারা
আমাদের এই আজাদীর জন্য
আমাদের এই পাকিস্তানের জন্য
জান দিয়েছে
মান দিয়েছে
সব দিয়েছে
দুশমনদের জিঘাংসা নিবৃত্ত করেছে।
আরও স্মরণ করি
সেই সব মসজিদ, মাদ্রাসা ও শিক্ষায়তনগুলোর কথা
এখন যেখানে
আজান নেই, নামাজ নেই, পবিত্র কোরান ও হাদীছের
বাণী স্তব্ধ। জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রদীপ নিভে গেছে।
দু’ ফোঁটা চোখের পানি
এই ব্যথা ভরা স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
আল্লাহ। তুমি কবুল করে নাও।

পাকিস্তান, মুসলিম লীগ ও মাদারে মিল্লাত—এই ত হ'ল জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার সার্থক স্মৃতি।

কায়েদে আজমকে বাদ দিলে যেমন পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের কথাই উঠতে পারে না, আমাদের আজাদী আন্দোলনের ইতিহাস কিছুতেই পূর্ণাংগ হতে পারে না, ঠিক তেমনি মাদারে মিল্লাতকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না।

মুক্তি সংগ্রামের সিপাহসালার যাঁকে 'আশা ও আলোর কিরণ' রূপে দেখেছেন—সেই মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ সম্পর্কে আমরা শুধু জানতাম—তিনি জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার পরম আদরের বোন। অথচ তিনি যেভাবে এই আদরের বোনটিকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন—তার কোনও গুরুত্ব আছে কি-না, আর তাতে দেশ ও জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কিছুমাত্র উপকৃত হয়েছে কি-না সেকথা ভেবে দেখার সময় ত অনেক আগেই এসেছে। কিন্তু তেমন সুযোগ আমরা করে উঠতে পারি নি।

মাদারে মিল্লাত সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে কিছু লিখতে যাঁদের কাছ থেকে উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি—তাঁদের মধ্যে আজাদী সংগ্রামের নির্ভীক সিপাহী পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক-নেতা জনাব

সিরাজুদ্দিন হোসেন [বার্তা-সম্পাদক : দৈনিক ইত্তেফাক] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর এই ঋণ তাঁরই মহত্ত্ব প্রমাণ করছে। এছাড়া আরও অনেক সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক বন্ধু রয়েছেন—যাঁদের নাম উল্লেখ করতে মন চাইলেও সাহস পেয়ে উঠি নি। —একটা সুদীর্ঘ ফিরিস্তি পাঠক ভাই-বোনদের কাছে হয়ত বিরক্তিকর লাগবে।

বই আকারে 'মাদারে মিল্লাত' প্রকাশের কাজে মেসার্স লতীফ বুক করপোরেশনের জনাব গোলাম রব্বানী ও আমার স্নেহের অনুজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মতীন—এই দু'জনার আগ্রহ ও তৎপরতা বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।

আশা করি—প্রত্যেকটি সত্যকার দেশভক্ত, গণতন্ত্রকামী পাকিস্তানী অবশ্যই স্বীকার করবেন, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা ও বুকভরা সাহস না থাকলে আজকের দিনে সহজে কেউ এ পথে এগোতে পারে না।

'মাদারে মিল্লাত' বইখানা আশা করি পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর সাথে আমাদের মানসিক পর্যায়ে একটা যোগ-সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আমার কাছে এ ব্যাপারে এটাই সব চাইতে বড় আশা। কিন্তু সারা দেশে যে বেপরোয়া পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে

আমার এই আশা হয়ত দুরাশা বলেই প্রমাণিত হবে।

তবে হতাশার প্রশ্রয়ও যে দিতে আমরা পারি না।

কারণ—আল্লাহ্ তায়ালার চাইতে কেউ বড় নয়। তাঁর চাইতে শক্তিও ত কারুর বেশী নেই। তিনিই ত নিজ বান্দাদের জন্য নিজের খুশী মোতাবেক অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর তাঁরই খুশী বাস্তবে পরিণত করেছেন পেয়ারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ আলা আলেহি অসাল্লাম—আজীবন সংগ্রাম সাধনার মারফতে সেই গণ-অধিকার কায়েম করে।

এখন আমাদের মধ্যেই যদি কেউ ভুল বুঝে, ভুল করে বসেন, তা শোধরানোর দায়িত্ব—ঈমান ও ইসলামের শর্তে—সবার উপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং তাতে ভড়্কে যাওয়াটাই ত অশালীন মনোভাব, বিকৃত রুচী ও বিকৃত স্বভাবের পরিচয়!

তবে মাবুদ আল্লার দরবারেই ত আমাদের সবাইকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। সব কাজ, সব কথা তাঁরই মহান দরবারে অবশ্যই রুজু করা হবে। তখনকার গ্লানি ও ব্যর্থতার কবল হতে রক্ষা পাওয়াই ত বিরাট সাফল্য।

এই কথাটি স্মরণ রাখতে না পারলে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সার্থকতা

কিছুতেই খুঁজে পাব না। আর এক্ষেত্রে ব্যর্থতার অর্থ—চরম বিপর্যয়।

তাই ত আমাদের দুশমনরা নানাভাবে তৎপর রয়েছে। কিন্তু আফসোস! আমাদের 'ভুলো বাদশার দল' যে গোঁফ বিলাসেই মশগুল! তাদের কাঁধে-পিঠে করেই ত আমাদের প্রকৃত চরম দুশমন শক্তিগুলো ধিকৃত, বিকৃত ও কুৎসিত যত সব বস্তুর নির্গলিতাংশ আমাদের এই সোনার পাকিস্তানের সবখানে ছড়িয়ে আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছে।

আর তা' সম্ভব হয়েছে সত্যকার গণতন্ত্রের হত্যাকাণ্ডের পরেই—আগে নয়।

যে পথ থেকে বিচ্যুতির ফলে এমন আশংকাজনক অবস্থা দেখা দিয়েছে—সেই পথে আশার চেষ্টা করাটাই ত একমাত্র সমাধান। পরিবর্তনের আশা করাটাও দোষের কিছু নয়। কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে বিপুল প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন—মূল আশার চাইতেও যে অনেক বেশী—একথাটি সঠিকভাবে বুঝতে যদি আমরা কিছুমাত্র সক্ষম হই তবেই মংগল।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সে সামর্থ্য দান করুন।

সত্য, ন্যায় ও গণ অধিকারের বিজয় পতাকা বুলন্দ হোক।

হাকীম আবদুল মান্নান

১লা জুলাই, ১৯৬৫
১৫।১ আরামবাগ, ঢাকা—২

সূচী

১। শৈশব ও শিক্ষা দীক্ষা—৬
২। মাদারে মিল্লাতের বিলাত সফর—১১
৩। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ পর্যটন—১৫
৪। মাদারে মিল্লাতের নূতন দায়িত্ব—১৭
৫। কায়েদে আজমের সেবা-যত্ন—১৮
৬। নিদারুণ সংকট—২০
৭। কায়েদে আজমের উৎসাহ-দাত্রী—২১
৮। অভ্যাস ও কর্ম তৎপরতা—২২
৯। কায়েদে আজমের নজরে মাদারে মিল্লাত—২৪
১০। মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার—২৫
১১। কায়েদে আজমের আহবান--২৭
১২। কায়েদে আজমের স্বপ্ন-সাধ—২৮
১৩। মাদারে মিল্লাতের কর্মতৎপরতা—২৯
১৪। কোহাট সম্মেলন--৩০
১৫। মুসলিম ছাত্রীসম্মেলনে ভাষণ—৩১
১৬। মুসলিম মহিলা কর্মীদের প্রতি অভিনন্দন—৩২
১৭। সত্যই বিস্ময়কর—৩৩
১৮। গণতন্ত্রের দিশারী—৩৪
১৯। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিস্ময়কর ঐতিহ্য—৩৫
২০। দাবী নয়—প্রতিষ্ঠা—৩৬
২১। মুসলিম মহিলা সম্মেলনে মাদারে মিল্লাতের ঘোষণা—৩৬
২২। 'আমার বোন : আলো ও আশার কিরণ'--৩৭
২৩। নাগরিক সংবর্ধনা—৩৮
২৪। বাস্তহারা মোহাজিরদের পাশে মাদারে মিল্লাত—৩৯
২৫। ভাই-বোনের একত্রে দেশের উভয় অংশে ভ্রমণ—৪০
২৬। স্নেহের বাঁধন—৪১
২৭। ফেলে আসা দিনগুলো—৪২
২৮। অতন্দ্র প্রহরা—৪৩
২৯। যে পথের শেষ নেই—৪৪
৩০। ভাইয়ার স্মৃতি : ভাইয়ার ডাক!—৪৫
৩১। অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী—৪৭
৩২। 'ফুল কাউন্সিলে পেশ করবে, এখন যাও'—৪৮
৩৩। মুসলিম নারী সমাজের মুক্তি দূত—৪৮
৩৪। আরও কঠিন বোঝা—৫০
৩৫। আরাম তিনি হারাম করলেন—৫০
৩৬। লাহোর সফর : কঠিন শপথ গ্রহণের আহ্বান—৫১
৩৭। শুধু কথা নয় : বাস্তব আদর্শ—৫২
৩৮। মহিলাদের রিলিফ কমিটি—৫৩
৩৯। হিসাব নিকাশের দায়িত্ব—৫৪
৪০। পূর্ব পাকিস্তানেও সমস্যার ভীড়—৫৫
৪১। দায়িত্ব সচেতন মাদারে মিল্লাত—৫৬
৪২। ঢাকার বুকে মাদারে মিল্লাত—৫৬
৪৩। চাটগাঁয়ে মাদারে মিল্লাত—৫৬
৪৪। জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ—৫৬
৪৫। তেজোদৃপ্ত ঘোষণা—৫৭

৪৬। সীমান্তের পাঠান মুলুকে—৫৭
৪৭। জাগো, পুর নারী সবে জাগো !—৫৮
৪৮। 'আমাদের আশা ও ভবিষ্যৎ শিশুদের ডাকে সাড়া দিন'—৫৮
৪৯। কোয়েটা সফর—৫৯
৫০। চরম বিপর্যয়ের ঘনঘটা—৬০
৫১। শোকার্ত জাতির কাছে এসে দাঁড়ালেন—৬০
৫২। 'কায়েদে আজম বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর রূহ বা আত্মা আমাদের সাথেই রয়েছে'—৬২
৫৩। জনগণের দুর্জয় মনোবল—৬২
৫৪। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে জনগণের হাতে—৬৩
৫৫। স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা আপনাদের আছে কি ?—৬৩
৫৬। শোক নয়—কর্ম প্রেরণা—৬৪
৫৭। মায়ের ডাক—৬৪
৫৮। 'শহীদানের কথা তোমরা স্মরণ কর'—৬৭
৫৯। জনগণই তাঁর একান্ত আপনজন—৬৮
৬০। জনগণই তাঁর শক্তির মূল উৎস—৬৯
৬১। জাতীয় জীবনে নূতন সূর্য—৭০
৬২। শয়তানী চক্রের বিভীষিকা—৭০
৬৩। বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী—৭২
৬৪। গবর্ণমেণ্ট হাউস, না রিলিফ ক্যাম্প !—৭৩
৬৫। মায়ের চোখ—মায়ের মন—৭৮
৬৬। মাদারে মিল্লাতের কাশ্মীর সফর—৭৯
৬৭। যুদ্ধের ময়দানে মাদারে মিল্লাত—৮০
৬৮। কত মায়াময় তাঁর মন !—৮৬
৬৯। মহিলা চিকিৎসক ও নার্সদের গুরুত্ব সম্পর্কে মাদারে মিল্লাতের ঘোষণা—৯১
৭০। জাতীয় জীবনে মহিলাদের ভূমিকা—৯১
৭১। দায়িত্বহীন সরকার ও বিত্তবানদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী—৯৫
৭২। শুধু শহর নয়, গ্রামবাসীদের কথাও স্মরণ রেখেছেন—৯৬
৭৩। মায়ের চোখে কেউ ছোট নয়—৯৭
৭৪। পাকিস্তানের বৃহত্তম তিব্বিয়া কলেজ উদ্বোধন—১০১
৭৫। নির্মম সেই দিনগুলো !—১০৩
৭৬। আজাদীর এই পতাকা—১০৯
৭৭। দেশরক্ষার প্রশ্নে দূরদৃষ্টি—১১০
৭৮। সীমাহীন গাফলতি—১১১
৭৯। গণতন্ত্র : পাকিস্তান ও মাদারে মিল্লাত—১১৪
৮০। গোমরাহির আবর্ত—১১৭
৮১। গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য—১১৯
৮২। মাদারে মিল্লাতের ভূমিকা—১২০
৮৩। ভাই-বোন : মধুর সম্পর্ক—১২৫
৮৪। ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব : মাদারে মিল্লাতের ব্যক্তিত্বে—১২৮
৮৫। ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়—১৩২

:-ভাই-বোন-: : মাদারে মিল্লাত :

মাদারে মিল্লাত

অপরাহ্নের কড়া রোদে ঝলমল রূপালী ভাইকাউন্ট বিমানখানা মারীপুর বিমান বন্দরে নামল।

একখানা এম্বুলেন্স গাড়ী এগিয়ে বিমানের দরজায় এসে দাঁড়াল।

বিমানের দরজা খুল্ল। কয়েক জন সিভিল ও মিলিটারী অফিসার বিমান থেকে বেরিয়ে এসে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াল।

দু'জন যুবক একখানা ষ্ট্রেচার কাঁধে নিয়ে বিমান থেকে বেরুল।

সাথে সাথে মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ বিমান থেকে অবতরণ করলেন। তাঁর পরনে ছিল ধবধবে সাদা পোশাক। কিন্তু তাতে একটু অগোছাল ভাব ছিল। চলার গতিতে তাঁর স্বাভাবিক সৌম্য পুরোপুরি বজায় ছিল। তবে তাঁর চেহারায় অস্থিরতা উদ্বেগ সুস্পষ্টই ছিল। তিনি ষ্ট্রেচারের সাথে এম্বুলেন্স গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

ইনি ছিলেন—পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

মাত্র তের মাস আগে দুনিয়ার বুকে একটি নয়া এবং বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কায়েম করার জন্য মাদারে মিল্লাতকে সংগে নিয়ে দিল্লী থেকে যখন করাচী পেঁাছে ছিলেন, তখন এই বিমান বন্দরেই শ্রদ্ধা ভক্তিতে আপ্লুত মন নিয়ে পাকিস্তানের জনগণের একটি বিরাট অংশ সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিল।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বিকাল বেলা পাকিস্তানের জনক যখন অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থার মধ্যে ষ্ট্রেচারে শুয়ে কোয়েটা থেকে করাচী এসে পৌছালেন, তখন বিমান বন্দরে জনকতক সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মচারী ছাড়া তেমন আর কেউ ছিল না।

ঘন বসতিপূর্ণ করাচী শহরের কেউ জানত না—দেশ ও জাতির ভাগ্যে কি ভয়ানক দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে।

না জানি এই জনদরদী ও জাতিগতপ্রাণ মহান নায়ক ও নিয়ম শৃংখলার মহান অনুসারী কি কারণে নিজের জাতিকে পূর্ণরূপে সুসংবদ্ধ করে গড়ে না তুলতেই, এমনি অসহায় অবস্থায় রেখে বিদায় নিতে প্রস্তুত হলেন।

এম্বুলেন্স গাড়ীখানা করাচীর জন বহুল কর্ম চঞ্চল এলাকা পার হয়ে গেল।

কিন্তু কেউ জানল না যে এই গাড়ীর ভেতরে কে শুয়ে রয়েছেন? আর তিনি কি অবস্থায় রয়েছেন? মনে হয়, দেশবাসী যদি জানতেই পারত, তা হলে লক্ষ কোটি মুসলমান---যারা নিজেদের জান, মাল, আবরু, ইজ্জতের কোরবানী দিয়ে পবিত্র মাতৃভূমিকে ইংরেজদের গোলামী আর ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের নাগপাশ হতে মুক্ত করেছে, নিজেদের কাছে বাকী যা ছিল, তাও তারা কোরবান করে দিত, নিজেদের প্রিয় নেতাকে মৃত্যুর হিম শীতল হাত থেকে ছিনিয়ে আনত—হায়! যদি তা সম্ভব হত!

রাতের আঁধার যতই নামতে লাগল—ততই নগর জীবনের কলকোলাহল শান্ত হয়ে আসতে লাগল।

এক রহস্যময় প্রশান্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। বুকের স্পন্দন---তাও যেন কেমন অবিন্যস্ত হয়ে আসছিল।

আজকের এই রাত কেন এত খাপছাড়া লাগছে? বাইরের বিপুল জনতার কেউ তা জানত না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট হাউসের কারুর কাছেই এই রহস্য অজানা ছিল না।

একটি কামরায় মাদারে মিল্লাত আর তিন জন ডাক্তার সেই অজেয় শক্তির সাথে মোকাবিলা করছিলেন—যার সামনে প্রাণী মাত্রই দুর্বল, অসহায়।

একা মাদারে মিল্লাত খাটের পাশে দাঁড়িয়ে একবার ডাক্তারদের দিকে, আবার বড় আদরের বড় ভাইয়াকে অসহায়ের মতই দেখছিলেন।

চোখে তাঁর পানি ছলছল করছিল।

ভাই বোনের মধ্যেকার সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে আসছিল।

অস্ফুট স্বরে ডাক্তারের কানে ভেসে আসল---'আল্লাহ...... পা-কি-স্তা-ন···'।

ডাক্তার ঘাবড়ে গিয়ে মাদারে মিল্লাতের দিকে তাকালেন।

ধৈর্যের বাঁধ ভেসে গেল। এক মর্মভেদী আর্তনাদ শোনা গেল, আর মাদারে মিল্লাত সম্বিত হারা অবস্থায় নীচে পড়ে গেলেন। কয়েক জন লোক এসে তাঁকে পাশের কামরায় নিয়ে গেল।

রাতের প্রথম প্রহরের অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার বুক চিরে মাদারে মিল্লাতের বুক ফাটা আর্তনাদ নবজাত দেশ ও জাতির আকাশ বাতাস ভেদ করে শূন্যে, মহাশূন্যে পেৌছে গেল।

পর দিন ভোরের সূর্য দেখল : নবজাত রাষ্ট্র পাকিস্তান শোকার্ত মানুষের চোখের পানিতে ভেসে গেছে। শোক ও বেদনার ঘন ঘোর মেঘমালা মনের আকাশ ঘিরে রেখেছে। সাতকোটি মানুষের বুক ফাটা কান্না দেখে সইতে না পেরে সেও যেন মেঘের আড়ালে মুখ লুকাল।

এক জন বুড়ো লোক শিশুর মত কান্নায় বুক ভাসিয়ে শোকার্ত জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছিল—তার হাতে ছিল কাফন আর এক শিশি আতর।

বছর কয়েক আগে সে যখন হজ্ব করতে গিয়েছিল, তখন কাফনের এই কাপড় জমজমের পবিত্র পানিতে ধুয়ে আর আতরের

শিশিটি পেয়ারা নবীজী (দঃ)-এর রওজা মুবারক ছুঁইয়ে এনে রেখে দিয়েছিল। তার আশা ছিল ঃ আল্লাহ যখন তাকে ডাকবেন, তখন যেন এই জিনিস দুটি আখেরাতের সফরে পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আজকে সে নিজের কথা একেবারে ভুলে গেছে। সে এই পবিত্র জিনিস দুটো প্রাণ-প্রিয় নেতাকে নজরানা হিসেবে পেশ করার জন্য নিয়ে এসেছে।

শোকার্ত জাতি নিজ হাতে প্রাণ-প্রিয় নেতার নশ্বর দেহখানা মাটির বুকে রেখে দিল। ধীরে ধীরে শোকের আগুন, ব্যথার আগুন বাড়তে লাগল।

সবাই মাথায় হাত দিয়ে আহত মনে ভাবছে ঃ

তা'হলে পাকিস্তানের দশা এখন কি দাঁড়াবে?

পণ্ডিত নেহেরু জোর গলায় হাঁক মেরে বলছিলেন ঃ

পাকিস্তানের কারবার এক দিনও চলতে পারে না।

মানভাদর, জুনাগড় দখলের পরে কাশ্মীর—পাকিস্তানের শাহরগ কেটে ফেলতে উদ্যত হলেন।

বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত সর্বহারা মুসলমান দলে দলে পাকিস্তানে আসতে লাগল।

পাকিস্তানের নদীগুলো প্রলয়ংকরী ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠানের জন্য যেন এই সময়টিকে বেছে নিল।

জাতির মন মস্তিষ্ক বেদনা জর্জর, শোকাকুল।

এরি মধ্যে ভারতীয় সেনা বাহিনী হায়দরাবাদের উপরে বর্বর আক্রমণ করে বসল।

পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠল।

শোকের আঘাত আরও তীব্রতর হয়ে উঠল।

রেডিও পাকিস্তান থেকে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত হচ্ছিল।

হঠাৎ থেমে গেল। কারীর কণ্ঠ ডুবে গেল।

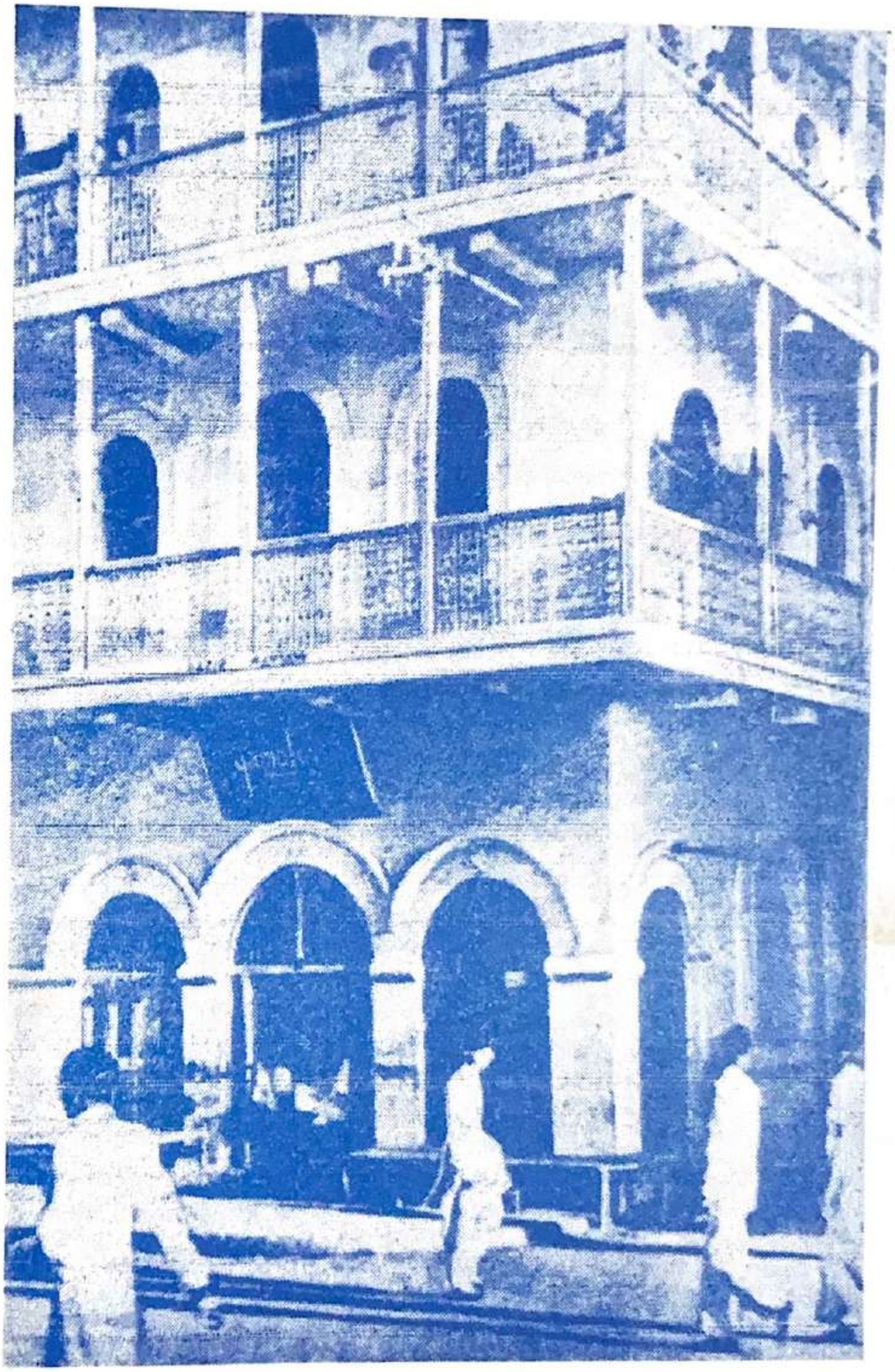

মাদারে মিল্লাত এই বাড়ীতে শৈশবে অতিবাহিত করেন।

: মাদারে মিল্লাত :

এনাউন্সার ধরা গলায় বল্ল ঃ

'আজকে সন্ধ্যায় মাদারে মিল্লাত শোকাকুল জাতির কাছে ভাষণ দেবেন।'

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই নারী পুরুষ ও শিশু বৃদ্ধের কাফেলা এসে রেডিওর কাছে ভিড় জমাল।

রেডিও এনাউন্সার যখন মাদারে মিল্লাতের নাম বল্ল ঃ তখন যেন সবারই বুক মন ভারী হয়ে এল। শ্রোতাদের চাপা কান্না ভেদ করে মাদারে মিল্লাতের কণ্ঠ শোনা গেল ঃ

> 'আমার প্রাণ-প্রিয় ভাইয়ের মর্ম বিদারী মৃত্যু শোক আপনাদের সবার সাথে সাথে আমাকেও ঘিরে ধরেছে। আমি বড়ই শোকাহত।'

শ্রোতাদের সবাই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

> 'খোদার মর্জি ছিল না---পাকিস্তানের খেদমতের জন্য কায়েদে আজম আমাদের মধ্যে এক বছরের বেশী সময় বেঁচে থাকুন। তবুও এই অল্প সময়ের মধ্যেও তিনি পাকিস্তানের বুনিয়াদকে বেশ মজবুতভাবেই গড়ে তুলেছেন। যা সহজে দুর্বল করা সম্ভব হবে না।...... পাকিস্তান এখনও শিশুই রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা দেশের জনগণের কাছে একটি পবিত্র আমানত রেখে গেছেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ঃ আপনারা নিজেদের সংকল্পে অটুট থাকবেন। নিজেদের কর্তব্য পালনে মোটেই অবহেলা করবেন না। কায়েদে আজম পাকিস্তানের জনগণের অন্তরে এক অক্ষয় স্মৃতি রেখে গেছেন। প্রত্যেকটি পাকিস্তানীর কর্তব্য সেই স্মৃতির কাছ থেকে পথের সন্ধান লাভের চেষ্টা করা।'

শোকাহত মাদারে মিল্লাত মুহ্যমান জাতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন ঃ

> 'কায়েদে আজম বেঁচে থাকতে যেভাবে আমি দেশ ও জাতির খেদমত করে এসেছি, তাঁর ইন্তেকালের পরেও পাকিস্তানকে

গড়ে তোলার জন্য—যা তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল—আমার প্রচেষ্টা আমি অব্যাহত রাখব। আমার সাধ্য শক্তি মোতাবেক মরহুমের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্যই আমি চেষ্টা করে যাব। আমার বিশ্বাস : আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমি সব সময়েই পাব। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

কিন্তু, পাকিস্তানের জনগণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল :

কি অদ্ভুত মেয়ে। নিজের শোক বেদনা দেশবাসীর শোক ব্যথায় এভাবে মিলিয়ে দিলে। আর জাতির পিতার মহাপ্রয়াণের ফলে শোকাশ্রু-প্লাবিত জাতির সামনে মূল দায়িত্বের কথা, কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

কে এই মহিলা ?

যিনি নিজের অশ্রু মুছে নিয়ে কর্তব্য পালনের অটুট সংকল্প ঘোষণা করছেন। আর সংগে সংগে জনগণকেও দেশ সেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

শৈশব ও শিক্ষা দীক্ষা

ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসাবে সুরক্ষিত করাচী শহরে নিওনহাম রোডের উপরে একটি তেতলা বাড়ী রয়েছে। গত শতাব্দীর শেষভাগে এই বাড়ীতে জিন্নাহ পুঞ্জা নামে একজন চামড়ার ব্যবসায়ী বাস করতেন। ১৮৭৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তাঁর একটি ছেলে হল। সেই ছেলেটির নাম রাখা হল—মোহাম্মদ আলী—যে শিশু একদিন বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বরিত হয়েছিল। এই শিশুটির পরে রহমত আলী, মরিয়ম আহমদ আলী, শিরীন ফাতেমা ও বন্দে আলী জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এদের সবার মধ্যে মোহাম্মদ আলী আর ফাতেমার নামই সর্বজন পরিচিত। আর বাকী সবাই অপরিচিত অজ্ঞাত থেকে গেল।

মাদারে মিল্লাত নিজেই বলেন :

'কায়েদে আজম আমার চাইতে বয়সে প্রায় ১৭ বছর বড় ছিলেন।'

মোহাম্মদ আলীর বয়স তখনও ষোল বছরও হয়নি, উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁকে ইংল্যাণ্ড পাঠান হল। তার মানে মাদারে মিল্লাত তাঁর বড় ভাইয়ার বিলাত যাওয়ার এক বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেন।

মাদারে মিল্লাতের বয়স তখন সবে মাত্র দু বছর। এ সময়ে তিনি মায়ের কোল হারা হলেন। পিতার স্নেহ আর ভাইবোনদের আদর যত্নের মধ্যে তিনি লালিত পালিত হতে থাকলেন। তার পরে যখন কথা বলতে আর কিছু কিছু বুঝতেও শিখলেন, তখন শুনলেন : সেই বড়ভাইয়ার কথা, যিনি সাত সাগরের ওপারে লেখা পড়া শিখতে চলে গেছেন।

ছোট্ট ফাতেমা ভাবতে লাগল : না জানি বড় ভাইয়া কেমন হবেন ?

বড় বোনের কাছে জিজ্ঞাসা করলে আপা মরিয়াম বলতেন : আমাদের বড় ভাইয়া কত সুন্দর, ফুটফুটে লাল গোলাপী চেহারা তাঁর, যেন চাঁদের টকরা।

ছোট্ট কচি ফাতেমা মনে মনে বড় ভাইয়ার ছবিখানা এঁকে নিতে চেষ্টা করত। কিন্তু তা যে পুরা হত না।

তাই সে বুক ভরা আশা নিয়ে আপার কাছে জানতে চাইত : 'আচ্ছা আপা, বড় ভাইয়া তা হলে কথা বলেন কেমন করে ?'

জওয়াব পেত : 'খু-উ-ব চমৎকার, ভা-রী সুন্দর। লেখা পড়া নিয়ে সব সময়ে ব্যস্ত থাকেন। আর যখন কথা বলতে শুরু করেন, তখন এত মিষ্টি, এত সুন্দরভাবে কথা বলেন যে শুনতে শুনতে চোখে ঘুম এসে যায়। আচ্ছা, তা হলে তুমিও এখন ঘুমোও।' মা হারা ছোট্ট কচি ফাতেমা আপার কোলে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু তার স্বপ্ন তখন জেগে ওঠে।

না-দেখা ভাইয়ার খোঁজে অজানা দেশে ছুটে যায় তার মন সোনালা স্বপ্নের পাখায় ভর করে। এমনি করে তিন তিনটি বছর কেটে গেল।

একদিন ছোট্ট ফাতেমা খেলাধুলার পরে বাসায় ফিরে এসে আপার কাছে শুনতে পেল ঃ 'আজকে বড় ভাইয়া আসবেন বিলাত থেকে।'

ফাতেমার আনন্দ আর ধরে না। সে দিন তার ক্ষুধা আর ঘুম—না জানি কোথায় মিলিয়ে গেল। অবশেষে ফাতেমার বড় ভাইয়া সত্যই এসে পড়লেন। ভাইয়াকে দেখে তার আনন্দের সীমা রইল না।

কিন্তু সে যেন কেমন একটু ঘাবড়ে গেল।

তাই দেখে বড় ভাইয়া নিজেই এগিয়ে গিয়ে ফাতেমাকে কোলে তুলে নিলেন। খুব আদর করলেন। তার মন থেকে সব দ্বিধা সংকোচ ভয় ভীতি দূর হল। আর সে রাতে ভাইয়ার মুখের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে শুনতে ছোট্ট কচি ফাতেমা ঘুমিয়ে পড়ল।

দেখতে না দেখতে একটি বছর না-জানি কেমন করে, কোথা দিয়ে কেটে গেল।

১৮৯৭ সালে বড় ভাইয়া বোম্বে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন। এ খবরটা জানতে পেরে ফাতেমা খুব চঞ্চল হয়ে পড়ল, আর সে কান্না শুরু করল।

ভাইয়া তাকে কোলে নিয়ে না জানি কানে কানে কি কথা বল্লেন, যা শুনে ফাতেমা অনেকটা সুস্থির হল। চিৎকার থামল বটে। কিন্তু চোখের পানি যে কিছুতেই থামতে চায় না।

সে বসে বসে দিন গুণতে লাগল। ভাইয়া তাকে কবে নিজের কাছে বোম্বে নিয়ে যাবেন। এক্ষণে ফাতেমার শিশু মন বোম্বাই শহরকে কেন্দ্র করে স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলতে লাগল।

যেখানে তার বড় ভাইয়া জীবন যুদ্ধে জয় লাভের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করছেন। অবশেষে তাঁর সাধনা ১৯০০ সালে সাফল্য মণ্ডিত হল। তিনি বোম্বের প্রেসিডেন্সা ম্যাজিস্ট্রেট

পদে নিযুক্ত হলেন। একখানা সুন্দর বাড়ীও তিনি পেলেন। তিনি নিজে একখানা সুন্দর ফিটন গাড়ী কিনলেন। এ ভাবে আর্থিক অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল হবার পরেই ছোট্ট বোনের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পুরা করার সময় উপস্থিত হল। অবশ্য তাঁর এই ওয়াদা তিন বছর আগেকার ছিল।

ছোট্ট ফাতেমা যখন বড় ভাইয়ার কাছে বোম্বে শহরে পেঁছিল, তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। এরই মধ্যে তার বাবা মারা গেলেন। বড় ভাইয়া তাকে নিজের কাছেই রাখলেন।

গল্প করতে করতে, কথায় কথায় তার মনে লেখা পড়ার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। এ ভাবে তিনি ফাতেমাকে বান্দ্রা কন্‌ভেণ্টে ভর্তি করার সংকল্প নিলেন। তাঁর এই সংকল্পের কথা জানতে পেয়ে আত্মীয় স্বজনদের সবাই ঘোরতর বিরোধিতা শুরু করল।

তখনকার দিনে কোনও মুসলমান পরিবারের মেয়ের পক্ষে সাধারণ স্কুলেও লেখা পড়ার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। সেখানে ফাতেমাকে না কি কনভেণ্টে ভর্তি করা হবে!

এ কিছুতেই হতে পারে না। তাই তারা সবাই উঠে পড়ে লাগল।

কিন্তু বড় ভাইয়া কিছুতেই দমবার মত পাত্র ছিলেন না! আর আত্মীয় স্বজনরাও বসে থাকল না। ফাতেমাকে তারা নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগল। তাকে নিরুৎসাহ করতে লাগল। অথচ বড় ভাইয়া তাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। তিনি ফাতেমাকে বুঝিয়ে বল্লেন ঃ

'একবার যে কাজের সিদ্ধান্ত করা হয়, তা কিছুতেই বাদ দেওয়া উচিত নয়।'

কর্ম জীবনের সূচনায় এই ছিল ফাতেমার প্রথম পাঠ। যা মহান ভাইয়ের কাছ থেকে ভবিষ্যতের বিরাট প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন বোন প্রথম বারে লাভ করেছে।

কায়েদে আজম ছোট্ট বোনকে কনভেণ্টে পাঠানর জন্যে কোনও রকম জোর জবরদস্তী মোটেই করলেন না। কারণ,

তার মনে স্কুলের নামে যে ভয় সৃষ্টি করা হয়েছিল তা তিনি কথায় কথায়, গল্পের মাধ্যমে দূর করলেন।

তার পরে একদিন ফাতেমাকে নিয়ে বড় ভাইয়া ফিটন গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে বেরুলেন। বেশ কিছু ক্ষণ ঘুরে কাটানর পরে তাকে নিয়ে বান্দ্রা এলাকায় গেলেন।

বেশ সুন্দর একটা বাড়ীর সামনে গাড়ী খানা থামালেন। সেখানে অনেকগুলো মেয়ে কত সুন্দর পরিষ্কার জামা কাপড় পরে লেখা পড়া ও খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিল।

কায়েদে আজম ছোট্ট বোন ফাতেমাকে কিছুই বল্লেন না। বরং চুপচাপ স্কুলের সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। ফাতেমা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন কায়েদে আজম সেখান থেকে বাসায় ফিরলেন।

এভাবে তিনি আরও কয়েকবার ফাতেমাকে নিয়ে বান্দ্রা কনভেন্টে ঘুরে এলেন। স্কুল সম্পর্কে ফাতেমার মনে যে ভয় জন্মান হয়েছে—তা যাতে দূর হয়, কায়েদে আজম সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

কয়েকবার যাতায়াতের ফলেই স্কুলের পরিবেশ সম্পর্কে ফাতেমার মনে বেশ আগ্রহ জন্মাল।

এক দিন সে নিজেই বড় ভাইয়ার কাছে আবদার করে বসল : আমাকে ওই স্কুলটাতেই ভর্তি করে দাও না।

ভাইয়া ত এই কথাটির জন্যই এত দিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি খুব খুশী হলেন। কিন্তু তখন কিছুই বল্লেন না।

পরে এক দিন ফাতেমাকে সঙ্গে নিয়ে বান্দ্রায় গেলেন। ফাতেমাকে সেখানেই রেখে এলেন। ফাতেমা যত দিন সেই স্কুলে ছিল, কায়েদে আজম প্রত্যেক রোববারে বোম্বে থেকে বান্দ্রায় যেতেন। আর সারা দিন ছোট বোনের সাথে কাটিয়ে আসতেন।

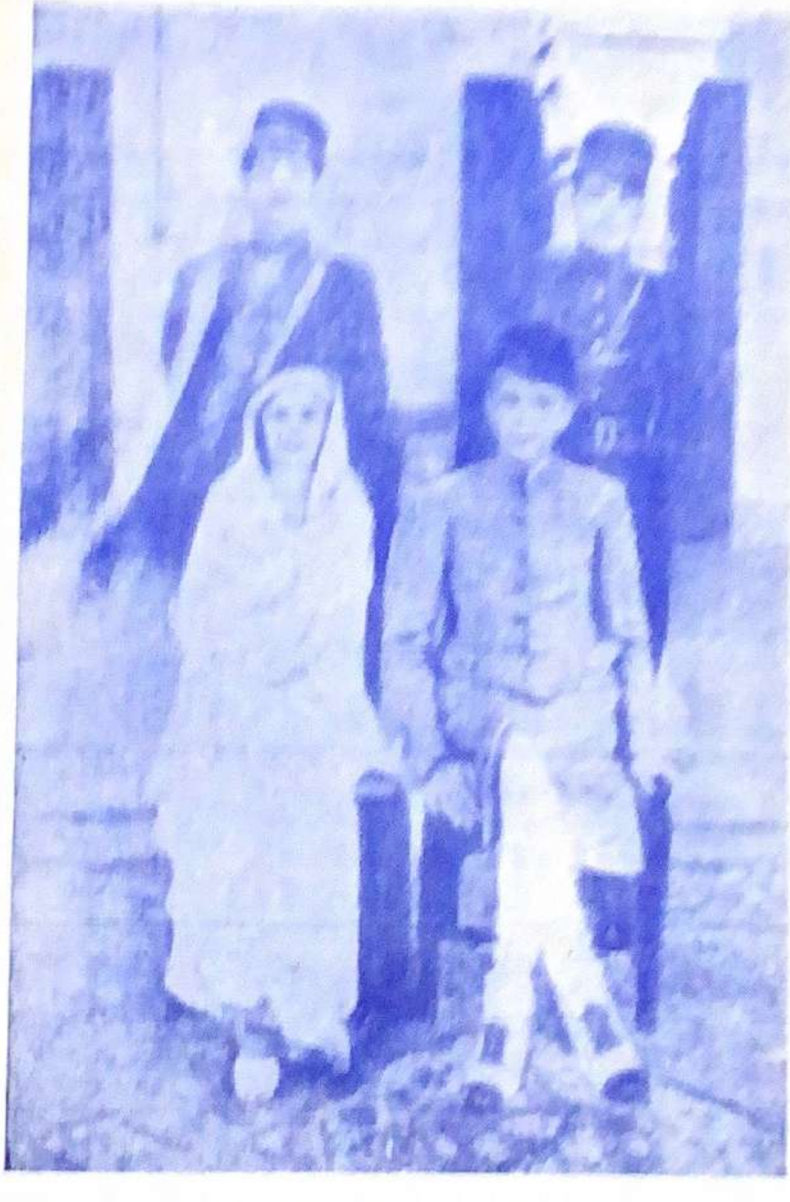

একটি ঐতিহাসিক তৈল চিত্র মাদারে মিল্লাত
ও কায়েদে আজমের। ঃ মাদারে মিল্লাত ঃ

স্কুল বন্ধ থাকলে ছোট্ট বোন ফাতেমাকে বাসায় নিয়ে আসতেন। এভাবে ফাতেমার ছুটির দিনগুলো বড় ভাইয়ার সাথে বেশ আনন্দের মধ্যেই কেটে যেত।

মাদারে মিল্লাত কনভেন্ট থেকে বেশ কৃতিত্বের সাথেই ম্যাট্রিক পাশ করে বড় ভাইয়ার কাছে এলেন। আর কায়েদে আজমের সব কাজ তিনি দেখা শুনা করতে লাগলেন।

আর কায়েদে আজম তার সব আবদার পুরা করতেন---ঠিক স্নেহ বৎসল পিতা যেমন করে থাকেন। কথা খুব কম বলা, আর লোকজনের সাথে তেমন বেশী মেলা মেশা না করাই ছিল কায়েদে আজমের স্বভাব। তা ছাড়া সব সময়ে আইন সংক্রান্ত পড়া শুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

কিন্তু ছোট্ট বোন ফাতেমার কথা তিনি মোটেই ভুলতেন না। ব্যস্ততা যতই থাক না কেন, ফাতেমার জন্য তিনি সময় বের করে নিতেন—বলতে গেলে নিজের অজান্তেই! সকাল বেলা যখন তিনি কোর্টে যেতেন, তখন ফাতেমাকেও সাথে নিয়ে যেতেন। বাসায় একা থাকতে যে ফাতেমার কষ্ট হবে, তাই ভেবে।

পথে তাকে বড় বোন বেগম পারভাইয়ের বাসায় রেখে তিনি কোর্টে যেতেন। সারাদিন সেখানে ফাতেমার বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটত।

কোর্টের কাজ সেরে সেখান থেকে ফাতেমাকে সাথে নিয়ে সোজা বাসায় না গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বেড়ানর পরেই বাসায় ফিরতেন। তার পরে এক সাথে বসে খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যার পরে আবার কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসতেন।

১৯১৮ সালে কায়েদে আজম স্যার দীনশা পেটিট-এর মেয়ে রতনবাইকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার পরে বিয়ে করলেন।

এবারেই ভাই বোনের মধ্যে আঠার বছরেব সাহচর্য প্রথম ও শেষ বারের মতই ক্ষুণ্ন হল।

আসলে দু জন আলাদাভাবেই থাকতে লাগলেন। ফাতেমা চলে গেলেন তাঁর বড় বোন বেগম পীরভাইয়ের বাসায়।

কিন্তু প্রত্যেক রোববার দুপুর বেলা বড় ভাইয়া ও ভাবীর সাথে আহার করতেন।

এভাবে আটটি বছর কেটে গেল। এক দিন ভাইয়ার কাছে আদরের বোন ফাতেমা বল্লেন: 'আমি বেকার বসে থেকে থেকে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমায় কলেজে ভর্তি করিয়ে দাও না।'

অনেক ভেবে চিন্তে বড় ভাইয়া তাকে পরামর্শ দিলেন: তুমি ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হবে। কাজটা তার মেজাজ মোতাবেকই ছিল। সুতরাং রাজী হওয়ার ব্যাপারটা বেশ সহজেই চুকে গেল।

তখনকার দিনে সারা ভারতে ডেন্টাল কলেজ মাত্র একটি—তাও আবার কোলকাতায় ছিল। তাই ভর্তির ব্যবস্থা করে তাকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হল।

দু-বছর পরেই সাফল্যের সাথে কোর্স শেষ করে ফাতেমা বোম্বে ফিরে এলেন বড় ভাইয়ার কাছে।

বোম্বে এসে তিনি প্রাকটিস শুরু করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তার প্রাকটিস বেশ জমে উঠল। কোথায় তিনি বেকার বসে থেকে হয়রান হচ্ছিলেন, আর এখন তার শ্বাস ফেলবার মত অবকাশ নেই। এরই মধ্যে একবার কায়েদে আজম বেগম জিন্নাহকে সাথে নিয়ে অবসর বিনোদনের জন্য ইংল্যাণ্ড চলে গেলেন। তখন একমাত্র সন্তান দীনাকে (জন্ম: ১৯১৯) তার ফুপু ফাতেমার কাছে রেখে গেলেন। তিনি দীনাকে নিজ সন্তানের মতই যত্নের সাথে রাখলেন। কায়েদে আজম ফিরে আসার পরে দীনা তাঁর কাছে চলে গেল।

১৯২৯ সালে বেগম জিন্নাহ বেশ কিছুকাল রোগ ভোগের পরে মারা গেলেন।

কায়েদে আজমের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু বলছেন : 'বেগম জিন্নার লাশ যখন কবরে রাখা হল, তখন কায়েদে আজম সব কিছু ভুলে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তিনি বুক ভরা আশা নিয়ে বড় যত্নের সাথে যে সংসার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এভাবে তা উজাড় হয়ে গেল।'

এ সময়ে আদরের বোন ফাতেমার পক্ষে দূরে থাকা সম্ভব হল না। তাই মাদারে মিল্লাত বড় বোনের বাসা থেকে কায়েদে আজমের বাসায় চলে এলেন। এখানে তিনি ঘরের সব কাজ নিজেই দেখা শুনা করতে লাগলেন।

এতদিন ফাতেমা ছিলেন কায়েদে আজমের কাছে মেয়ের মতই। কিন্তু এবারে তিনি মায়ের আসন দখল করলেন। কায়েদে আজম মন-মরা উদাস শিশুর মতই ছোট্ট বোন ফাতেমার অ াচল ধরে আশ্রয় পেলেন বলা যায়।

একটি বৎসর না যেতেই লণ্ডনে ভারতীয় নেতাদের গোলটেবিল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল। কায়েদে আজম, আল্লামা ইকবাল এঁরাও সেখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ পেলেন।

এই সম্মেলনে সমবেত মুসলিম ভারতের চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতাগণ মুসলমানদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন।

মাদারে মিল্লাতের বিলাত সফর

কায়েদে আজম যখন গোলটেবিল কনফারেন্সে যোগদানের জন্য ইংল্যাণ্ড রওয়ানা হলেন, তখন পরম আদরের বোন (মাদারে মিল্লাত) আর একমাত্র সন্তান দীনাকেও সংগে নিলেন।

উক্ত কনফারেন্সের ফলাফল দেখে কায়েদে আজম মুসলিম ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়লেন। অত্যন্ত মর্মাহত অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিলেন :

বিলাতেই থেকে যাবেন। আর সেখানে আইন ব্যবসায় নিয়ে জীবনের বাকী সময়টুকু কাটিয়ে দেবেন। তাই তিনি বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে প্রাক্‌টিস শুরু করলেন। কায়েদে আজম নিজে এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

'আমি হিন্দু মানসিকতা, হিন্দু সংকীর্ণতা, এবং হিন্দু হঠকারিতার কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারি নি। আমি এই জন্যই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়লাম। আর মুসলমানদেরকেও আমি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে পারি নি। তাই আমি মর্মাহত অবস্থায় লণ্ডনে বসবাস করার সংকল্প নিয়েছিলাম।'

কায়েদে আজম লণ্ডনের ওয়েষ্ট হীথ রোডের উপরে একখানা তেতলা বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। মেয়ে দীনাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ঘরের সব কাজ আর নিজের সব চিন্তা ভাবনার বোঝা ফাতেমার (মাদারে মিল্লাত) উপরেই ন্যস্ত করলেন। আর তিনি নিজে আইনের বই পুস্তক ও ফাইল পত্রের মধ্যে ডুবে রইলেন।

এই সময়ে কায়েদে আজমের সাথে ফাতেমার অবিচ্ছিন্ন যোগ সম্পর্ক সাহচর্য কায়েম হল। তিনি বড় ভাইয়ার সাথে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার সময়ে বোম্বে শহরে সেই যে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, তাতে আর কোনও দিন পরিবর্তন ঘটে নি। তিনি কায়েদে আজমের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি বারও নিজের কথা মোটেই ভাবেন নি। যেন তিনি নিজেকে একেবারে ভুলেই গিয়েছেন।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ পর্যটন

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ লণ্ডনের এই প্রবাস জীবনের স্মৃতি উল্লেখ করে বলেছেন :

> 'এ সময়ে আমরা ইয়োরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরে দেখেছি। সে সব দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণের জীবন-ধারা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমরা পেয়েছি।'

কিছুদিন পরে নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হন (১৯৩০ সাল)। তিনি সেখানে কায়েদে আজমের সাথে দেখা সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা করেন। তিনি কায়েদে আজমকে জোর দিয়ে বলেন—যাতে তিনি এখানে আর বেশী দিন দেরী না করে দেশে ফিরে আসেন।

বেগম লিয়াকত আলী খানও এই ঘটনা সম্পর্কে বলছেন :

> 'মিস জিন্নাহ কায়েদে আজমের সব কাজ দেখা শুনা করতেন। আমার মনে হত, কায়েদে আজমকে দুনিয়ার কোনও শক্তি এই শান্তির নীড় থেকে বাইরে টেনে আনতে পারবে না।'

সে যাই হোক, কায়েদে আজম একটি শর্তে দেশে ফিরে আসতে রাজী হলেন :

> তিনি (লিয়াকত আলী) দেশে ফিরে আসার পরে পরিস্থিতি সম্পর্কে নূতন ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। আর তিনি যদি দরকার মনে করেন, তবে কায়েদে আজমকে লিখবেন।

অবশেষে কায়েদে আজম ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে এলেন। এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান করলেন।

বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনার পরে তিনি সেই বৎসরই বিলাত ফিরে যান। তাঁর ইংল্যাণ্ড অবস্থানকালে বোম্বের

মুসলমানগণ তাঁর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই তৎকালীন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তাঁকে নির্বাচিত করলেন।

১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানের জন্য আরেক বার তিনি ভারতে আগমন করেন। কিন্তু এপ্রিল মাসেই আবার তিনি ইংলেণ্ডে চলে যান। অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকেন।

তখনকার অবস্থা সম্পর্কে মাদারে মিল্লাত এভাবে উল্লেখ করেছেন :

> '১৯৩৫ সালে আমরা ভারতে ফিরে এলাম। ভারতের মুসলমানগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগের সংগঠন বলতে তেমন কিছুই ছিল না বলা যায়। কিন্তু কায়েদে আজমের উপরে জাতির মনে অটুট আস্থা ছিল। তাই ভবিষ্যতের সব কিছুই তারা তাঁর হাতে সোপর্দ করে দিল। কায়েদে আজম এই বিরাট দায়িত্ব মাথা পেতে নিলেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হলেন।'

মাদারে মিল্লাতের নূতন দায়িত্ব

পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনীতিতে কায়েদে আজম পনরায় অংশ গ্রহণের ফলে মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার দায়িত্ব অনেক গুণবেড়ে গেল। তাঁকে এত দিন শুধু আপন ভাইকে আর ঘর সংসারের কাজ-কর্মই দেখাশোনা করতে হত। অবশ্য একাজে ভাইয়ার পরামর্শও শামিল ছিল। কিন্তু এক্ষণে একা তাঁকেই সব কাজ-কর্ম সামাল দিতে হল। আরভাইয়ার উপরে আইন-আদালতের কর্ম-ব্যস্ততা ছাড়াও রাজনীতির চাপ বেড়ে গেল।

কায়েদে আজমের স্বভাব প্রকৃতিও ছিল বড়ই অদ্ভূত। স্বীয় নীতির মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি যে কোনও মূল্য দিতে সব সময়ে প্রস্তুত থাকতেন। শরীর, টাকা-পয়সা কোনও বিষয় তিনি নীতির সামনে বড় করে দেখতে মোটেই রাজী ছিলেন না। শরীর যতই খারাব হোক না কেন, তিনি কোনও দিন কারুর কাছে বলতেন না ; নিজের কাজ নিয়ে তিনি দিনরাত ব্যস্তভাবেই কাটিয়ে দিতেন।

এই আপন-ভোলা লোকটিকে যদি কেউ কোনও দিন বুঝতে পেরে থাকেন, তবে তা তিনি একমাত্র ফাতেমা জিন্নাহ ছাড়া আর কেউ নন। আদরের সেই ছোট্ট বোন—বড় ভাইয়াকে ঠিক মায়ের মতই দেখাশোনা করতে লাগলেন বড় আদর যত্নের সাথেই।

কায়েদে আজমের রুচী-পছন্দ এ সবের দিকে তিনি সব সময়ে খেয়াল রাখতেন।

তাঁর জন্য খাবার তৈরীর সময়ে তিনি নিজে রান্না ঘরে উপস্থিত থাকতেন। আর আহারের সময়ে তিনি কায়েদে আজমের

এক একটি গ্রাস বা লোকমার দিকে লক্ষ্য রাখতেন ঠিক মায়েদের মতই।

খাবার শেষ করে শোবার ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি কায়েদে আজমের কাছেই বসে থাকতেন।

কায়েদে আজমের সেবা-যত্ন

ঘর-সংসারের সব কাজ কর্মের দায়িত্ব মাদারে মিল্লাতের উপরেই ন্যস্ত ছিল। তিনি সব কাজ স্বাধীনভাবেই সম্পাদন করতেন।

কোনও ব্যাপারেই স্বয়ং কায়েদে আজম নিজেও কোনও সময় দখল দিতেন না। কায়েদে আজম এমনিতে খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। কোনও ব্যাপারেই তিনি বেহুদা খরচ অপব্যয় মোটেই পছন্দ করতেন না। তবে কি না ছোট চাকর-বাকরদের এক আধটু বাড়াবাড়ি তিনি জেনে শুনেও এড়িয়ে যেতেন।

কিন্তু আর সব ব্যাপারের মতই কারুর কোনও ভুলত্রুটি মাদারে মিল্লাতের নজর এড়িয়ে যেতে পারত না। একবার তিনি ঘরের দু'জন চাকরকেই চুরির দায়ে বরখাস্ত করে দিলেন। কিন্তু কায়েদে আজম এ ব্যাপারে কিছুই বল্লেন না। তাই বেশ কিছু দিন ধরে হোটেল থেকেই খাবার এল।

কায়েদে আজম যখনই বাইরে যেতেন, আদরের বোন ফাতেমা জিন্নাহ সব সময়ে তাঁর সাথে থাকতেন।

রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতায় কায়েদে আজমের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়াও কায়েদে আজমের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনের দিকে সব সময়ে লক্ষ্য রাখতেন।

কায়েদে আজমের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাতলুব হোসেন সৈয়দ বলেন:

'দক্ষিণ ভারতের সফর কালে এক জায়গায় আমরা কিছুক্ষণ থেমে ছিলাম। এই অবকাশে মিস জিন্নাহ আমাদের সবার

জন্যই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেল্লেন।'

সফর কালে ফাতেমা জিন্নাহ সব সময়ে কায়েদে আজমের সাথেই থাকতেন। কিন্তু যদি কোনও বিশেষ কারণে শরীক হতে না পারতেন, তা হলে বড় ভাইয়ার খোঁজ-খবর নিতেন নিয়মিত ঠিক মায়েদের মতই। রোজ তিনি চিঠি লিখতেন।

উত্তর পেতে একটু দেরী হলে আর উপায় ছিল না। সংগে সংগেই হয় টেলিফোন করতেন, নইলে টেলিগ্রামযোগে খোঁজ-খবর নিতেন।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কায়েদে আজম ও মাদারে মিল্লাত মাউণ্ট প্লিজান্ট রোডের উপরে গোয়ানিজ টাইপের যে বাড়ীখানায় থাকতেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ছোটই ছিল। তাই কায়েদে আজম নিজের ছোট বাড়ীখানা নিলামে বিক্রি করে দিয়ে মালাবার হিল রোডে নয়া বাড়ী তৈরা করে নিলেন। এক বছরের মধ্যেই তাঁদের নতুন বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। কায়েদে আজম ও মাদারে মিল্লাত নতুন বাড়ীতে এসে এত দিনকার কার্যসূচীতে প্রয়োজনীয় রদবদল করে নিলেন।

এতদিন কায়েদে আজম একাই লেখা পড়ার সব কাজ করতেন। সেক্রেটারী কিংবা ক্লার্ক কেউ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে তিনি ছিলেন : কায়েদে আজম। মুসলিম ভারতের একচ্ছত্র নায়ক।

মাউণ্ট প্লিজাণ্ট রোডের উপরের এই বাড়ীতে বসেই রফিক সাবের নামে একজন খাকসার কায়েদে আজমের উপরে ছুরি নিয়ে হামলা করেছিল। তিনি নিজে যদিও দুর্বল ক্ষীণকায় ছিলেন, কিন্তু তিনি আক্রমণকারীর হাত এমন মজবুতভাবে ধরলেন যে, তার জঘন্য পরিকল্পনা আর সফল হল না। কায়েদে আজম চিবুক ও হাতে আঘাত পেলেন। মাদারে মিল্লাত অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেই আহত বড় ভাইয়ার জখমে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। ডাক্তার ডেকে পাঠানো হল তারপরেই।

কায়েদে আজমের আহ্বানে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম

জনগণমনে আন্দোলন যতই মজবুত ও জোরদার হতে লাগল, কায়েদে আজম ততই নিজের ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্পর্কে খুব বেশী বে-খেয়াল হয়ে পড়তে লাগলেন। এমন কি নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তেমন লক্ষ্য রাখতে পারতেন না।

বড় ভাইয়ার অবস্থা দেখে মাদারে মিল্লাত অস্থির উদ্বিগ্ন হয়ে কায়েদে আজমকে কিছু বলতে গেলে উল্টা তাকে রাজনীতির ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বলতেন। ফলে বাধ্য হয়ে ফাতেমা জিন্নাকে একই সময়ে দুটো কাজ বেশ মনোযোগের সাথেই করতে হত। আর তিনি দুটোতেই সফল প্রমাণিত হতেন।

১৯৪৬ সালে সিমলা কন্‌ফারেন্সের সময়ে কায়েদে আজম বেশ কিছু দিন ধরে ক্রমাগত অসুস্থ অবস্থায় কাটালেন। কনফারেন্সের কাজ খতম হওয়ার পরেই কায়েদে আজমের শরীর আরও ভেংগে পড়ল। মাদারে মিল্লাত সাথেই ছিলেন। তিনি কায়েদে আজমের অবস্থা দেখে খুব ঘাবড়ে গেলেন। তিনি কায়েদে আজমের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ জন প্যাটেলকে টেলিফোন যোগে তৈরী থাকতে বল্লেন। অবিলম্বে তাঁকে নিয়ে বোম্বে উপস্থিত হলেন। আর সেখানে সেবা-যত্ন ও চিকিৎসার ফলে কায়েদে আজম অল্প দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

নিদারুণ সংকট

কিন্তু দেশের অবস্থা—বিশেষ করে মুসলিম ভারতের অবস্থা তখন বড়ই সংকটজনক ছিল। অবস্থা এমনই গুরুতর হয়ে উঠল : কায়েদে আজমের জন্য—মুসলিম ভারতের স্বাধীনতা অথবা নিজের স্বাস্থ্য এই দুটোর মধ্যে যে কোন একটি জিনিস বেছে নেয়া ছাড়া আর কোনও পথ বাকী রইল না। কায়েদে আজম নিজের স্বাস্থ্যের তুলনায় মুসলমানদের স্বাধীনতাকেই অগ্রাধিকার দান করলেন। অথচ ভাইয়ার স্বাস্থ্যের জন্য দুনিয়া

জাহানের সব কিছু বিসর্জনে প্রস্তুত ছিলেন। আদরের ছোট বোন ফাতেমা জিন্নাহ কায়েদে আজমের এই সিদ্ধান্তকে আল্লার হুকুম বা তাকদীরের ফায়সালারূপে মেনে নিলেন। শুধু তাই নয়, মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ দুর্বল ক্ষীণকায় বড় ভাইয়ার দেহমনে এক নতুন প্রাণবন্যা এনে দিয়ে দেশ ও জাতির উপরে যে কি বিপুল ইহসান মেহেরবানী করলেন, দেশবাসীর অনেকেই তা জানে না। সুতরাং সে সম্পর্কে কোনও রকম সুস্পষ্ট অনুভূতি কারুর মধ্যে না থাকাটাই স্বাভাবিক।

কায়েদে আজমের উৎসাহ দাত্রী

দেশবাসীর ধারণা অনুভূতি এ সম্পর্কে যাই থাক না কেন স্বয়ং কায়েদে আজম নিজ মুখে আদরের ছোট বোন ফাতেমা জিন্নার বিপুল অবদানের কথা পাকিস্তানে আগমনের পরে এক বক্তৃতা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন :

> 'যখন বৃটিশ সরকারের হাতে সব সময়ে আমার গ্রেফতার হওয়ার অশঙ্কা ছিল, তখন আমার এই বোন ফাতেমাই ছিল— যে নাকি আমাকে সব সময়ে সাহস জুগিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে। নানাবিধ সমস্যার চাপে অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে আসত, তখন সেই কঠিন দুর্যোগ মুহূর্তে আমার এই বোনইত আমাকে সাহস জুগিয়েছে।'

কায়েদে আজম যখন বৃটিশ সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্যে বোম্বে ছেড়ে দিয়ে দিল্লীতে এসে থাকতে লাগলেন, তখন মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহও কায়েদে আজমের সাথেই দিল্লীতে আসলেন।

পাকিস্তান আন্দোলনে মাদারে মিল্লাতের ভূমিকা

কায়েদে আজম উঁচু পর্যায়ে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় সারা দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। আর মাদারে মিল্লাত দিল্লীর মুসলিম মহিলাদের সংগঠন নিয়ে মশগুল হয়ে রইলেন। তাঁরই অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনার ফলে অতি অল্প সময়ের ভেতরেই দিল্লীর মুসলিম মহিলাদের মধ্যে অপূর্ব জাগরণ দেখা দিল। এ সময়ে দুই ভাই-বোনের মধ্যে খাবার টেবিলেই দেখা সাক্ষাৎ হত। তখন একে অন্যের কাজ-কর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন এবং জরুরী পরামর্শ করে নিতেন।

ভাইস্‌রয়ের নিমন্ত্রণেও দু'জন একত্রেই শরীক হতেন।

এ ভাবে এই দুই ভাই-বোনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলেই মুসলিম ভারতে এক অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভারতের দশ কোটি মুসলমান এক হয়ে এক মনে, এক মুখে, কর্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সংখ্যা গড়িষ্ঠ হিন্দু ও ক্ষমতাসীন ইংরেজদের জারিজুরি ও কারসাজি নস্যাত করে দিয়ে মঞ্জিলে মকসূদের দিকে এগিয়ে গেল মজবুত কদমে। গোটা কওম আজাদির মঞ্জিলে পৌঁছে গেল যেন চোখের নিমিষে!

অভ্যাস ও কর্মতৎপরতা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে মাদারে মিল্লাতের রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতা অনেক গুণ বেড়ে গেল। তা ছাড়া কায়েদে আজমের দেখাশুনার কাজও আগের তুলনায় অনেক ভারী হয়ে পড়ল। ফলে তিনি মোটেই অবকাশ পেতেন না। সুতরাং এই পর্যায়ে আমাদেরকে একটু থেমে স্বয়ং মাদারে মিল্লাতের কাছ থেকেই তার নিজের অভ্যাস, চরিত্র, কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নেয়াটাই ভাল।

একবার তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন :

> 'এরপর থেকে অবকাশ বলতে আমার কিছুই রইল না। তবে যদি কালেভদ্রে কখনও এক আধটু সময় পেয়ে বসতাম, তখন খানিকক্ষণ টেনিস খেলতাম। ছবি আঁকতে আমার ভালো লাগে খুবই। আমার ঘুম ভেংগে যায় খুব সকালেই। খবরের কাগজ পড়া শেষ করেই আমি রুটিন মোতাবেক রোজকার কাজ শুরু করে থাকি। সাধারণতঃ সকাল সাড়ে ছটায় আমি বেড়াতে যাই।'

এর পরে একটু হেসে বল্লেন ঃ

> 'লোকজন আমার নামে জবর গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে যে, আমি না কি খুবই কৃপণ। আমি সময় সুযোগ মোতাবেক বেশ খরচ করি। আর আমি জানি, কখন কি পরিমাণ খরচ করতে হবে। আর তাতে আমি মোটেই ঘাবড়ে যাইনে। আমি টাকার দামও জানি। টাকা পয়সা-ত আর এজন্য কামাই করা হয় না যে, তা খামাখাই লুটিয়ে দিতে হবে। একটি পয়সারও আমি হিসাব রেখে থাকি। অকারণ পয়সা খরচ হতে আমি দিই না।
>
> আমার মতে প্রত্যেকটি মুসলমানের কর্তব্য নিজেদের পরিশ্রমের কামাই রোজগার অনাবশ্যক বিনষ্ট না করা। আমাদের মধ্যে সব চাইতে মারাত্মক দোষ হচ্ছে এই যে, আমরা সবাই অমিতব্যয়ী।
>
> প্রত্যেকটি পাকিস্তানীর কর্তব্য—যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব এই মারাত্মক দোষত্রুটি সমূলে দূর করতে চেষ্টা করা।'

মাহমুদাবাদের রাজা আমির আহমদ খানের বর্ণনায় দেখা যায় ঃ কায়েদে মিল্লাত কখনও বাসার মধ্যে থাকতে জোর গলায় কথা মোটেই বলেন না।

কায়েদে আজমের খেলার সাথী

মাদারে মিল্লাত সব সময়ে কায়েদে আজমের অবসর বিনোদনে শরীক থাকতেন। কায়েদে আজম বিলিয়ার্ড খেলতে ভালোবাসতেন খুবই।

মাঝে মাঝে দেখা যেত দুই ভাই-বোন এক সাথেই বিলিয়ার্ড রুমে ঢুকছেন। কায়েদে আজম যখন ঠিক মত স্ট্রোক করতেন, আর তাতে তিনি পুরো পয়েন্ট দখল করতেন: তখন তিনি ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে বিজয় গর্বে বুক ফুলিয়ে হেসে নিতেন একচোট খুব করে।

কায়েদে আজমের নজরে মাদারে মিল্লাত

মাদারে মিল্লাতের জীবন ধারা ও রোজকার কর্ম সূচী সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা এর আগেই করা হয়েছে। এবারে আমরা কায়েদে আজমের ভাষায় মুসলিম মহিলাদের অভূতপূর্ব জাগরণে মাদারে মিল্লাতের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করব।

কায়েদে আজম মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুসলিম মহিলাদের জাগরণ একান্ত অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই কর্ম-পন্থা কোনও প্রকার রাজনৈতিক ভাওতা বা ধোকাবাজীর শামিল ছিল না। রাজনীতিতে কোনও প্রকার ধোকাবাজীর বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না। বরং তিনি সেটাকে বড় ঘৃণার চোখেই দেখতেন। তাঁর যা কিছু করার ছিল, তা তিনি প্রকাশ্যে বলে দিতেন। তাতে যদি সাময়িক-ভাবে তার ক্ষতির আশংকাও থাকত—তবুও। তিনি বড় পাকা মুসলিম ছিলেন। তিনি যখন ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে পেঁৗছলেন, তখন তিনি লিংকন ইন্সকেই পসন্দ করলেন।

কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন: 'এই শিক্ষায়তনের সিংদরজার

ফলকে যে সকল মহান আইন প্রণেতার নাম লেখা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে আমাদের পেয়ারা নবীজী (দঃ)-এর পবিত্র নামও দেখা যায়।'

তখনও কিন্তু বৃটেনেও মহিলাগণ পুরুষদের সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভে সক্ষম হন নি। কিন্তু সে জন্য সমানে আন্দোলন চলছিল। জাতির পিতা কায়েদে আজম তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলেন। সে সময়ে একবার সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। আর তাতে দাদা ভাই নওরোজী সেন্ট্রাল ফিনসবেরী এলাকায় লিবারেল দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেন। বৃটেনের অভিজাত আমির উমারার দল এতে নাক সিটকাতে লাগল। এমন কি তাদের আচরণ শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। দাদাভাই নওরোজীর কার্য সূচী তে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদানের কথাও ছিল। এই জন্যই সেখানকার মহিলাগণও তার সমর্থনে এগিয়ে এলেন। এমন কি বিশ্ববিখ্যাত মহিলা ফ্লোরেন্স নাইটিংগলও দাদাভাই নওরোজীর সমর্থণে কাজ করতে এগিয়ে আসেন। বৃটেনের মহিলাদের অবিশ্রান্ত চেষ্টা পরিশ্রমের ফলেই দাদাভাই নওরোজী সেই নির্বাচনে জয়লাভ করলেন। ভোটের মামুলী ব্যবধান থাকলেও তখনকার দিনে বৃটিশ পার্লামেন্টে কোনও ভারতীয় লোকের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, কল্পণাতীত ছিল।

ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই ঘটনার মূলেও কায়েদে আজমের বেশ সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। এখানেই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদের কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শূন্যগর্ভ কোনও কথা একটিবারও মুখে উচ্চারণ করেন নি। তিনি

যখন দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন থেকেই তিনি নিজের এই বিশ্বাস মোতাবেক কাজ করে এসেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে ১৯১৮ সালের সেই বিখ্যাত ১১ই ডিসেম্বরের ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। বোম্বে প্রেসিডেন্সীর তৎকালীন গবর্ণর লর্ড উইলিংডনের চাকুরীর মেয়াদ ফুরিয়ে এলে বোম্বাইয়ের কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী, সুবিধাবাদী ও চাটুকারদের উদ্যোগে তাকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন করা হল। কায়েদে আজম এতে বোম্বে শহরের সাধারণ নাগরিকদের চরম অপমান মনে করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন :

যেভাবেই হোক না কেন, তল্পী বাহকদের এই জারী জরি অবশ্যই লণ্ড ভণ্ড করে দিতে হবে।

কায়েদে আজমের এই সংকল্পের কথা স্থানীয় পুলিশ ও গুণ্ডা বাহিনী জানতে পেল। কায়েদে আজম রাতারাতি সব আয়োজন করে ফেল্লেন। নিজের সমর্থকদেরকে ডেকে এনে সেই সাত সকালে সবাইকে টাউন হলের গেটে মোতায়েন করে দিলেন। কায়েদে আজম নির্দিষ্ট সময়ে সস্ত্রীক এসে পড়লেন। এসেই তিনি সবার আগে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং দরজা খুলবার সাথে সাথেই ভিতরে ঢুকে পড়লেন। এভাবে তিনি দলবল নিয়ে সামনের আসনগুলো দখল করে বসলেন।

গুণ্ডা দল এসে তাঁদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্য নানা রকম চেষ্টা চরিত্র করতে লাগল। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই বিফল হল। কারণ বেগম জিন্নাহ নিজে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পথ আগলে ছিলেন। আর নিজেদের দলের লোকজনকে বেছে বেছে হলের মধ্যে ঢুকতে দিতেন।

গুণ্ডা দলের ব্যর্থতার পরে সেখানে পুলিশের লোকজন এসে

হাজির হল। তারা ভিতরে এসেই লাঠি চালাতে শুরু করল।

কায়েদে আজম আর তাঁর সংগী সাথীরা অদ্ভুত মনোবল নিয়ে পুলিশের এই জোর জবরদস্তী বরদাশ্‌ত করে নিলেন। তবুও নিজ সংকল্পে তিনি অটুট রইলেন। উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরেই তিনি সেখান থেকে ফিরলেন।

সরকার সমর্থক দলের সভা আর সেখানে হতে পারল না। এই ঘটনার পর হতে বোম্বে শহরের লোকদের কাছে কায়েদে আজম একজন 'হিরো' রূপে গণ্য হলেন। তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে এই ঘটনার স্মারক হিসেবে 'জিন্নাহ হল' নির্মাণ করেন।

কায়েদে আজমের আহ্বান

কায়েদে আজম নিজেও বরাবর মাঝে মাঝে মহিলাদের রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে নিখিলি ভারত মুসলিম লীগের সভাপতির অভিভাষনে কায়েদে আজম ঘোষণা করলেন :

> 'আমার ধারণা মতে আমাদের এই জীবন মরণ সংগ্রামে আমাদের মেয়েদেরকেও অংশ নিতে দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে।'
>
> কয়েক বছর পরে তিনি আরেকবার বল্লেন :
>
> 'যত দিন পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের মেয়েরাও এগিয়ে আসতে না পারবে, সব কাজে তারা সমান অংশ নিতে না পারবে, তত দিন আমাদের এই জাতি সাফল্য এবং উন্নতি লাভে সক্ষম হবে না।'

কায়েদে আজমের স্বপ্ন-সাধ

মাদারে মিল্লাত—যিনি সেই আট বছর বয়সে বড় ভাইয়ের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরই আদর যত্নে তিনি বড় হয়েছেন, তাঁর মন মস্তিষ্ক ও চিন্তা ধারা কায়েদে আজমের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত থাকবে কি করে? তাই তিনি নিজেই এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন :

> 'আমি বলতে গেলে সেই ছোট বেলা হতেই রাজনীতির সাথে রীতি মত অল্প বিস্তর সব সময়েই জড়িত রয়েছি। কিন্তু খুব মনোযোগের সাথে রীতিমত রাজনীতি শুরু করি আমি ১৯৩০ সাল হতে। কায়েদে আজমের কাছে সারা ভারতের নামজাদা রাজনৈতিক নেতাগণ প্রায়ই যাতায়াত করতেন। আমি তাঁদের কথাবার্তা আলাপ আলোচনা বেশ মনোযোগের সাথেই শুনতাম। তার পরে আমি যখন একটু বড় হলাম, তখন আমি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জনসভা ও অধিবেশন সমূহে নিয়মিত শরীক হতে লাগলাম। দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আমার মনে বেশ আগ্রহ ছিল। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় সত্য হচ্ছে এই যে কায়েদে আজমের কাছে থেকে, রাজনীতির কোনও প্রভাব গ্রহণ না করা, সোজা কথায় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয় কি? পরে অবশ্য আমি কায়েদে আজমের সাথে কাঁধ মিলিয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে থাকি।'

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি পদ গ্রহণের পরে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঝড়ের বেগে ছুটে বেড়ালেন।

মাদারে মিল্লাত প্রায়ই কায়েদে আজমের সাথে থাকতেন। আর মুসলিম লীগের কথা, কায়েদে আজমের বাণী, দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে শত পর্দার অন্তরালে আবদ্ধ মুসলিম মা বোনদের কাছে সব

কথা পেঁাছে দিতে লাগলেন। তাদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ নেবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন।

মাদারে মিল্লাত ফাতেমা জিন্নার অক্লান্ত চেষ্টা চরিত্র পরিশ্রমের ফলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রতিটি প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা এবং শহর এলাকায় মহিলা সংগঠনের শাখা কায়েম হয়ে গেল।

মাদারে মিল্লাতের কর্ম তৎপরতা

পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের প্রায় এক বৎসর আগে ১৯৩৯ সালে কায়সারবাগে অনুষ্ঠিত বোম্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মহিলা শাখার সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দান প্রসংগে মাদারে মিল্লাত বলেছিলেন:

'অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে—মুসলিম লীগ কি কাজ করে? এ যাবত মুসলিম লীগ এমন কি কাজ করেছে, যা নাকি উল্লেখ করা যেতে পারে? মুসলিম লীগ ইসলামের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করেছে। মাত্র দুটো বছর না যেতেই মুসলমানদের মধ্যে আত্ম বিশ্বাস এনে দিয়েছে। মুসলিম লীগ ইসলামের দুশমনদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এ ছাড়া মুসলিম লীগ আরও এমন অনেক কাজ করেছে, যার বিবরণ দিতে গেলে সময় লাগবে অনেক।'

'আমাদের এখন দরকার—নিস্বার্থ পুরুষ ও মহিলা কর্মীর। যেন আমরা নিজেদের শক্তি সামর্থ্য বলতে যা কিছু যোগাড় করতে পারি তাতে কোনও রকম ত্রুটি মোটেই না থাকে। তার পরেই আমরা মঞ্জিলে মকসূদের দিকে যেন এগিয়ে যেতে পারি। পথের যত বাধা বিপত্তি রয়েছে, তা যেন অনায়াসে দূর করা যায়।'

'আমি আমার বোনদের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি: আপনারাও এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের যথা সর্বস্ব উৎসর্গ

করে জীবন মরণের এই গুরুতর সমস্যার মোকাবেলা করতে পুরুষের সাথে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসুন।'

পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের পরে এই প্রস্তাবের মূল তাৎপর্য মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার জন্য, এবং এই প্রস্তাব যাতে সত্যই কার্যকরী হয় সে জন্য সক্রিয় অভিযান পরিচালনা করেন সর্ব প্রথমে আমাদের মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ।

কোহাট সম্মেলন

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কোহাটে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এক সম্মেলনে মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ বলেন ঃ

'আমরা মুসলিম জাতি—অনেক অনেক দিন ধরেই ত বেশ সুখের ঘুমে কাটিয়ে দিয়েছি। ফলে আর সব কওম আমাদেরকে দুর্বল মনে করে নানা দিক থেকে কেবল কোণ ঠাসা করে রাখার জন্যই চেষ্টা করে আসছে।'

'আমরা যদি আরও কিছু দিন এমনি শুয়ে কাটাতে পারতাম, তাহলে আমাদের নাম নিশানাও যে এই উপমহাদেশের বুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না।'

'তবে আল্লাহ তায়ালার লাখো শুকরিয়া—সময় সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু অনুভূতি দেখা যাচ্ছে।'

'এ কথা আমাদের জানা উচিত যে আমাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে আমাদের শক্তি সামর্থ্যের উপরেই। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে ঃ নিজের শক্তি সামর্থ্য মোতাবেক নিজের পরিবার, পড়শী, বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে কর্ম প্রেরণা সৃষ্টি করা। হিন্দুরা আমাদের চাইতে সংখ্যায় তিন গুণ বেশী। এই জনই লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ একথা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে ভারতকে বিভক্ত করতে হবে। এই

LATAMGER
VILLAG
LEB 20

কোহাটের পথে মাদারে মিল্লাত

প্রস্তাব লাহোর অধিবেশনে মঞ্জুর করা হয়েছে। আর সেই প্রস্তাবটাকেই পাকিস্তান প্রস্তাব বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আসলে এই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপরেই পাক ভারত উপমহাদেশের শান্তি শৃংখলা ও সকল সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে। মূলতঃ ভারতের যাবতীয় রাজনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে : পাকিস্তান কায়েম করা।'

মুসলিম ছাত্রী সম্মেলনে ভাষণ

১৯৪৩ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্রীফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনের দিল্লী অধিবেশনে মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করলেন :

'আপনারা যারা এখানে সমবেত হয়েছেন, তারা ত খুবই ভাগ্যবতী। কারণ আপনরা ত লেখা পড় শিখবার মত অনেক সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যবিড়ম্বিতা বোনদের অবস্থার যাতে পরিবর্তন ঘটে সে জন্য আমাদেরকে অনেক কাজই ত করতে হবে। তবে কি মোটামুটিভাবে আমাদেরকে অনেক পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু সে কাজটি ত আমাদেরকেই করতে হবে—আজাদীর পথ যাতে সকল রকম বাধা মুক্ত হতে পারবে। এক্ষণে আমরা বড়ই কঠিন নাজুক অবস্থার মধ্যে রয়েছি। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটি বৃদ্ধ, যুবক, নারী, পুরুষ জীবন-মরণ সমস্যার সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। একতা, শৃংখলা ও ঈমানকেই নিজেদের মূলনীতি হিসেবে মেনে নিন, আর নিষ্ঠার সাথে তা আঁকড়ে ধরুন। সাফল্য নিশ্চয়ই আপনাদের পায়ের তলায় এসে যাবে—ইনশা আল্লাহ।

মহিলা সম্মেলনে উদাত্ত আহ্বান

মাদারে মিল্লাত সেই বছরই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আরেকটি মহিলা সম্মেলনে ভাষণ দান প্রসংগে বলেন :

'তোমরা স্মরণ রাখবে এ কথা---এই মেয়েদেরই হাতই আজকের তরুণ এবং আগামীকালের শিশুদের জীবন সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে। এই মায়েদের হাতই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে গোটা কওমকে মজবুত বুনিয়াদের উপরে গড়ে তুলতে পারে। এসো! আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য নিজেদের সাধ্য শক্তি অনুসারে চেষ্টা করি।'

মুসলিম মহিলা কর্মীদের প্রতি অভিনন্দন

১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত মীনা বাজার উদ্বোধন কালে মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করেছিলেন :

'আমার বোনদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক নির্বাচনে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। লাহোরের দুটো আসন আর সারা প্রদেশের বাকী ৭৯টি আসন দখল করে পাঞ্জাবের মুসলমান জনসাধারণ দুনিয়ার বুকে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে, যে তারা শুধু পাকিস্তান চায়। পাকিস্তান ছাড়া তাদের আর কিছুই যে কাম্য নয়। আপনারা যদি এভাবেই কাজ করতে থাকেন, এভাবেই যদি দিনরাত পরিশ্রম করতে থাকেন, তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমরা অবশ্যই পাকিস্তান কায়েম করতে পারব।'

এর পরে মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ করাচী, বোম্বাই, এ সব শহরে গিয়ে মুসলিম মহিলাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে কায়েদে আজম যখন তৎকালীন গবর্নর জেনারেলের সাথে চূড়ান্ত ফায়সালা করার জন্য বোম্বাই থেকে স্থান বদল করে দিল্লীতে আসলেন, তখন মাদারে মিল্লাতও তাঁর সাথে এলেন। এবং সেখান থেকেই সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

প্রখ্যাত সমাজকর্মী হাবিবা মেহমানদী তখনকার অবস্থা সম্পকে লিখছেন ঃ

> 'আমরা দিনরাত পরিশ্রম করে দিল্লীর প্রতিটি অলি গলিতে মেয়েদের জন্য এবং বয়স্কদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুল্লাম। যেখানে কায়েদে আজমের পয়গামও পেঁাছে দেওয়া হত। সেই অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্ন গলির মধ্যে কাজ করতেও কর্মীদের সবাই হাসি মুখে এগিয়ে যেত। আর প্রত্যেক মহল্লার ত্রৈমাসিক বৈঠকে মাদারে মিল্লাত নিজে নেতৃত্ব দান করতেন। আর আমাদের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে কায়েদে আজমের কাছে রিপোর্ট পেশ করতেন। মাদারে মিল্লাতের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম মহিলাদের আন্দোলন আল্লাহ তায়ালা কবুল করলেন। তাই ত এত অল্প সময়ের মধ্যেই পর্দানশান মায়েরা, মেয়েরা সবাই কর্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে সময়ে দিল্লীতে মুসলিম মহিলাদের এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। তাতে এমন ঘরের মেয়েরাও শরীক হয়েছিলেন, যাদের ছায়াও বাইরের কেউ কোনও দিন দেখতে পায়নি।'

সত্যই বিস্ময়কর

কায়েদে আজম সেই অপূর্ব অভাবিত দৃশ্য দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি সভাপতির অভিভাষণে ঘোষণা করলেন ঃ

'একটি রাজনৈতিক সভায় এত বিপুল সংখ্যায় মুসলিম মহিলাদের সমাবেশ একথাই প্রমাণ করছে যে সত্যই আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। এখন আর দুনিয়ার বুকে এমন কোনও শক্তি নেই যে না কি আমাদেরকে উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। এক্ষণে পাকিস্তান অবশ্যই কায়েম হবে।'

কালক্রমে কায়েদে আজমের এই ভবিষ্যদ্বানী বাস্তবে পরিণত হল। তাঁর এই বাণী ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় আসন গ্রহণ করল।

গণতন্ত্রের দিশারী

১৯৪৭ সালের ৩১শে মে ভারতের তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন বৃটিশ সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার পরে যখন ভারতে ফিরে এসে কায়েদে আজম ও পণ্ডিত নেহেরুকে ডেকে ভারত বিভাগের পরিকল্পনার কথা বল্লেন, পণ্ডিত নেহেরু কিন্তু সংগে সংগেই ইংরেজ বড়লাটের প্রস্তাব সেখানে বসেই মেনে নিলেন।

কিন্তু গণতন্ত্র—বিশেষ করে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কায়েদে আজম নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সাথে আলোচনা না করে কোনও রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজী হলেন না। এমন কি তিনি ব্যক্তিগতভাবেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও রকম মন্তব্য করতেও অস্বীকার করলেন।

ইংরেজ বড়লাট বাহাদুর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কারণ তার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল।

কিন্তু কায়েদে আজম পাহাড়ের মতই অবিচল ছিলেন। তাঁর মত পাল্টানোর জন্যে নানা রকমে চাপ সৃষ্টি করা হল। কিন্তু কায়েদে আজম কিছু মাত্র দমলেন না। বরং তিনি সাফ জবাব দিলেন:

''আইন বিধান মোতাবেক আমি মুসলিম লীগ কাউন্সিলের

অধিবেশনে আলাপ আলোচনা না করে একটি কথাও বলতে পারি না।"

লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন শেষবারের মতই একেবারে নিম্ন পর্যায়ে নেমে এসে ধমকের সুরে বল্ল :

'তা হলে আপনার পাকিস্তানও আপনি চিরতরে হারালেন, তাই বুঝতে হবে।'

কিন্তু কায়েদে আজম নিজের কাঁধে একটু ঝাকুনী দিয়ে বল্লেন :

'তা যা হয় পরে দেখা যাবে।'

অবশেষে বড়লাট হতাশ হয়ে ভদ্রতা ও শালীনতার পথে এগোতে বাধ্য হল। সে বল্ল :

'আমি নিজ দায়িত্বে কায়েদে আজমের পক্ষ নিয়ে শর্ত সাপেক্ষে পরিকল্পনা অনুমোদনের কথা ঘোষণা করে দেব। আর যদি মুসলিম লীগ কাউন্সিল মূল পরিকল্পনা বাতিল বা অগ্রাহ্য করে দেয়--তবে ভুল বিবৃতির সব দায়িত্ব আমি নিজের মাথায় তুলে নেব।'

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের বিস্ময়কর ঐতিহ্য

পর দিন ৩রা জুন—অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে ভারতের স্বাধীনতা ও ভারত বিভাগের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হল।

এরপরেই পণ্ডিত নেহেরু কংগ্রেসের মঞ্জুরীর কথা ঘোষণা করলেন।

অবশেষে কায়েদে আজম মুসলিম ভারতকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দান করেন।

মূল পরিকল্পনা মঞ্জুরীর কথাই এভাবে ঘোষণা করা হল না। বরং ইংরেজ সরকার ও হিন্দু কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র আর মুসলমানদের নিয়ম নিষ্ঠা এবং পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রতি মুসলমানদের

অবিচল আস্থার ঐতিহাসিক দলিল রচিত হল। মাত্র কয়েক মিনিট আগে বড়লাট বাহাদুর যে ঘোষণা প্রচার করলেন সে দিকে কায়েদে আজম মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করে ঘোষণা করলেন :

> 'আগামী ৯ই জুন তারিখে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক আহবান করা হয়েছে। কারণ আমাদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একমাত্র কাউন্সিলের এখতিয়ারে রয়েছে।'

এই ঐতিহাসিক বেতার ভাষণেও কায়েদে আজম পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণী বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

দাবী নয়—প্রতিষ্ঠা

পাকিস্তান—এখন আর দাবী কিংবা আন্দোলনের বস্তু হিসেবে রইল না। বরং প্রতিষ্ঠার শুভ মুহূর্ত এসে পড়ল। মুসলিম ভারতের জন্য নিশ্চয়ই এটা একটা অপূর্ব আনন্দ উৎসব ছিল সে কথা বলা বাহুল্য।

মুসলিম মহিলা সম্মেলনে মাদারে মিল্লাতের ঘোষণা

১৯৪৭ সালের ২৭শে জুলাই।

দিল্লীর মুসলিম মহিলাদের এক সম্মেলনে মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করলেন :

> 'আজকে আমরা বিশ্বের ইতিহাসে সব চাইতে বিস্ময়কর অপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি। এই বিরাট সাফল্যের কারণে আমরা যত খুশী—আনন্দ প্রকাশ করতে পারি। তেমন অধিকার আমাদের রয়েছে। আমি মুসলিম ভারতের প্রত্যেকটি বোনের জন্য গর্ব অনুভব করছি। আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা মোবারকবাদ তাদের সবাইকে জানাচ্ছি।'

মাদারে মিল্লাত এ সময়ে একটু থেমে পড়লেন।

বান্নুর জনগণ মাদারে মিল্লাতের বক্তৃতা শুনছেন।

: মাদারে মিল্লাত :

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি মুসলিম জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন :

'১৫ই আগষ্ট আমাদের নুতন রাষ্ট্র কায়েম হতে চলেছে। আর সেই সংগে আমাদের উপরে এক কঠিন দায়িত্ব এসে পড়বে। আর তা হচ্ছে : জাতি গঠনের কাজ। এ ধরণের কাজে অনেক বেশী পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও মজবুত মনোবলের দরকার সব চাইতে বেশী। আমরা যুদ্ধ জয় করেছি বটে। এক্ষণে আমাদেরকে শান্তিকে জয় করতে হবে। আমরা নিজেদের ঘর ফিরে পেয়েছি। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের বাসঘর খানাকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা।'

'আমার বোন : আলো ও আশার কিরণ'

মাদারে মিল্লাত সেই সাত আট বছর বয়সে করাচী থেকে বড় ভাইয়ার কাছে বোম্বেতে এসে ছিলেন। তার পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী কেটে গেল। বড় ভাই ও ছোট বোন দুজনা এক সাথে নূতন একটি রাষ্ট্র যা নাকি দুনিয়ার বুকে সব চাইতে বড় মুসলিম রাষ্ট্র—তারই বুনিয়াদ কায়েম করার জন্যে, এশিয়ার বৃহত্তম জাতিকে নিজ পায়ে দাঁড় করানর আশা বুকে নিয়ে করাচী নগরীতে ফিরে এলেন। মাদারে মিল্লাত নিজেই এ সম্পর্কে বলছেন :

'আমি গোলামীর ঘন অন্ধকারের মধ্যে এই শহর ছেড়ে গিয়েছিলাম। আর আজকে আজাদীর সূর্যকরোজ্জল পয়গাম নিয়ে ফিরে এলাম।'

১৯৪৭ সালের ৭ই আগষ্ট।

কায়েদে আজম ও মাদারে মিল্লাত নয়া দিল্লীর সফদরজংগ বিমান বন্দরে পেঁাছালেন। ভাইসরয়ের রুপালী ডাকোটা বিমান খানা তাদেরকে নিয়ে করাচী যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে ছিল।

বিমানে আসন গ্রহণের পরে কায়েদে আজম দিল্লীর দিকে একবার তাকিয়ে বল্লেন :

'আমার মনে হচ্ছে যে বোধ হয় এই শেষ বারের মতই দিল্লী শহর দেখছি।'

বিমানটি যখন দ্রুত বেগে রানওয়ের উপরে ধাবমান হল, তখন কায়েদে আজম বল্লেন :

'চলো, সব ঝামেলা চুকে গেল।'

চার ঘণ্টা পরে বিমান খানা মারীপুর বিমান বন্দরে অবতরণ করল। তখন সেখানে কয়েক লক্ষ্য মুসলমান নিজেদের প্রাণপ্রিয় জাতীয় নেতাকে সম্বধনা জ্ঞাপনের জন্য সমবেত হয়েছিল। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল।

বিমান থেকে প্রথমে কায়েদে আজম তাঁর পেছনে মাদারে মিল্লাত নীচে অবতরণ করলেন।

বিমান বন্দর থেকে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে সে কি জনতার ভীড়! পাকিস্তান জিন্দাবাদ ও কায়েদে আজম জিন্দাবাদ ধ্বনিতে চারি দিক গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

গবর্ণমেণ্ট হাউসে আসার পরে কায়েদে আজম স্বীয় এ. ডি. সি. লেঃ ইহসানকে বল্লেন :

'তুমি কি জান যে, আমি বেঁচে থাকতে পাকিস্তান কায়েম হবে, সে আশা আমার মোটেই ছিল না। এ জন্য ত আমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিশেষভাবে অশেষ শোকর আদায় করা।'

তার পরে কায়েদে আজম গবর্ণমেণ্ট হাউসের আগাগোড়া একবার ভালো করে দেখলেন। তিনি একটি অংশ পসন্দ করে বল্লেন :

'এই অংশটি আমার এবং মিস জিন্নার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর ওদিকের দুটো কামরা বিদেশী বিশিষ্ট মেহমানদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।'

নাগরিক সম্বর্ধনা

করাচী আসার পরে শহরের মহিলাদের তরফ থেকে এনেক্স ক্লাবে মাদারে মিল্লাতকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন

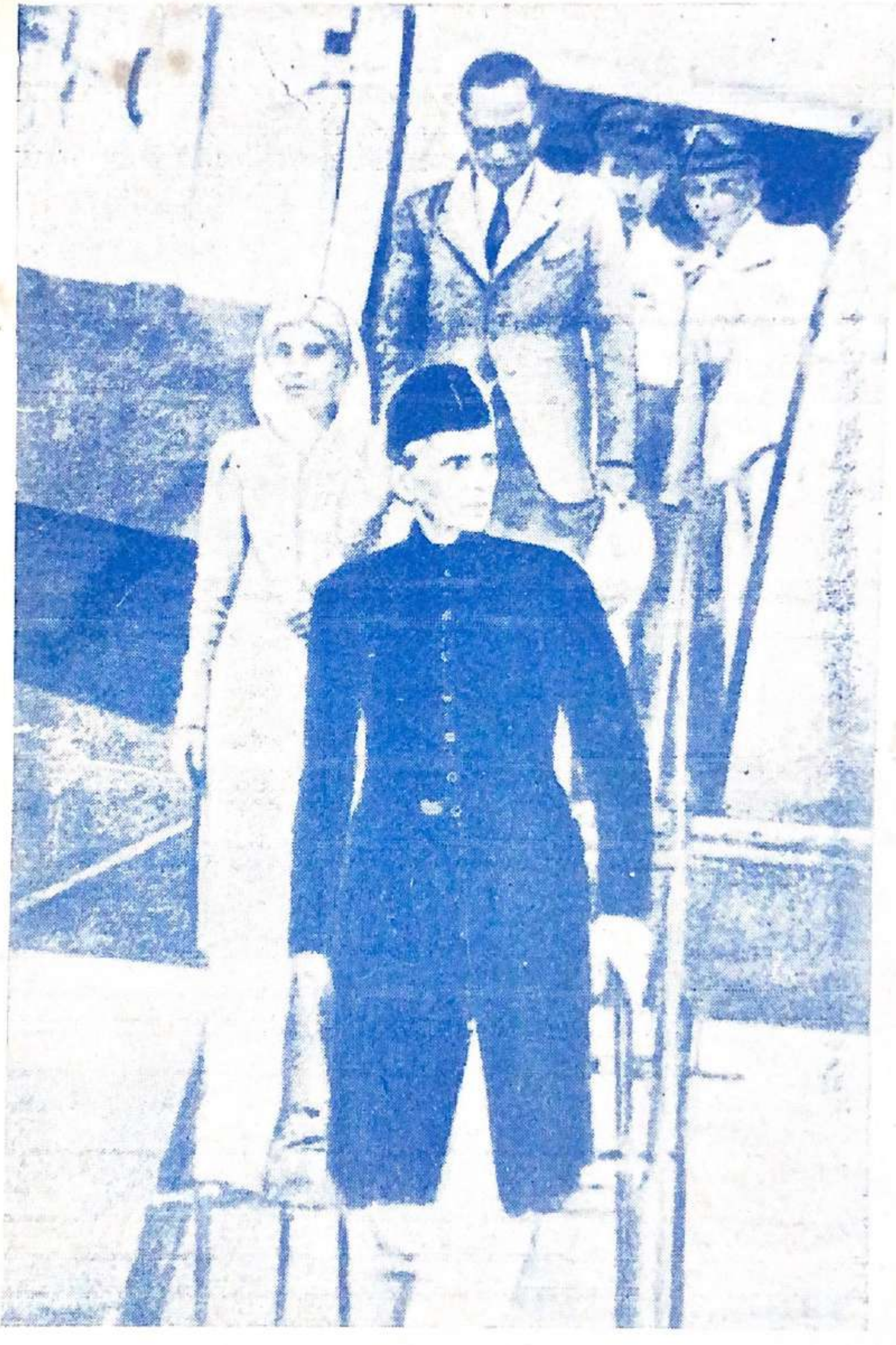

পাকিস্তানের বুকে মাদারে মিল্লাত ও কায়েদে আজমের প্রথম পদার্পন

: মাদারে মিল্লাত :

করা হল। সে অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মানপত্রের জওয়াবে মাদারে মিল্লাত বল্লেন :

'এখানে আসার পরে আপনাদের সাথে মিশতে পেরে আমি যে কত আনন্দ অনুভব করছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আজকে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হয়েছি। পাকিস্তান রাষ্ট্র ১৪ই আগষ্ট কায়েম হতে যাচ্ছে। আমি আশা পোষণ করছি : আপনাদের সবাই পুরুষদের সাথে সাথে এই নূতন রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য নিজেদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন। ঠিক তেমনি, পাকিস্তান হাসিলের জন্য আপনারা যে ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এভাবে আপনারা নিজেদেরকে দুনিয়ার বুকে আদর্শরূপে গণ্য করতে সক্ষম হবেন, আশা করি।'

বাস্তহারা মোহাজিরদের পাশে মাদারে মিল্লাত

পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম নারী সমাজকে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মাদারে মিল্লাত যেভাবে দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, সে কথা আগেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখনও আমরা দেখছি করাচীতে আসার পরে তিনি আরাম আয়েশের দিকে লক্ষ্য না করে সারা দিন মোহাজির ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে ছিন্নমূলদের খোঁজ খবর নিতে, তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেলেন ঠিক মায়ের মতই বুক ভরা স্নেহ মমতা নিয়ে।

অথচ তিনি যদি আরাম করতে চাইতেন, তবে তাতে কেউ বাধা দিত না।

সে যাই হোক, মাদারে মিল্লাত সম্পূর্ণ আলাদা ধাতু দিয়ে গড়া মেয়ে। তিনি নিজে বিত্তবানদেরকে এবং সরকারী কর্মকর্তাদেরকে মোহাজিরদের সুযোগ সুবিধার জন্য, তাদেরকে সকল রকম সাহায্য সহযোগিতা দানের জন্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিতে লাগলেন।

মোহাজিরদের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও খাওয়া দাওয়ার তদারক তিনি নিজে করতে লাগলেন।

ভাই-বোনের একত্রে দেশের উভয় অংশে ভ্রমণ

আল্লাহ তায়ালার অপার মেহেরবানীতে পাকিস্তান কায়েম হল। আর জাতির পিতা কায়েদে আজমের কর্ম ব্যস্ততা অনেক গুণ বেড়ে গেল একান্ত স্বাভাবিকভাবেই। মাদারে মিল্লাত কিংবা কায়েদে আজম কারুরই নিজের স্বাস্থ্য আরাম বিশ্রামের দিকে মোটেই খেয়াল ছিল না।

তেমন উপাদানে তারা তৈরী হন নি।

দিন নেই, রাত নেই জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ কিভাবে আরও মজবুত হবে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুশমনদের ষড়যন্ত্র কিভাবে নিস্ত নাবুদ করা যাবে—এই নিয়ে তাঁদের চিন্তা ভাবনা ও চেষ্টা সাধনার অন্ত ছিল না।

আল্লাহ পাক যেন তাঁদের দুজনকেই মুসলমান কওমের খেদমতের জন্যই পয়দা করেছিলেন। আর তাঁরাও যেন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সতর্ক সজাগ সচেতন ছিলেন। ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত অবধি থাকে না।

সে যাই হোক কায়েদে আজম এবং মাদারে মিল্লাত বেরিয়ে পড়লেন দেশের উভয় অংশের বিশাল জনতার কাছে হাজির হবার উদ্দেশ্যে।

তাঁরা এলেন।

বেশুমার জনসভায় বেশুমার জনগণের চোখে মুখে চেহারায় জীবনের পরশ বুলিয়ে দিলেন তাঁরা। গোটা কওমকে তাঁরা একসূত্রে বেধেঁ দিয়ে গেলেন। জাতি এভাবে জিন্দেগীর রাজপথে এগিয়ে এল।

কিন্তু হাজার হাজার মাইল পথ পরিক্রমের ফলে জাতির পিতা কায়েদে আজমের স্বাস্থ্যের উপরে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

কায়েদে মিল্লাতের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় যোগদানের জন্য মাদারে মিল্লাত ও কায়েদে আজম পদার্পন করছেন।

: মাদারে মিল্লাত :

স্নেহের বাঁধন

কায়েদে আজমের শরীরের অবস্থা দেখে মাদারে মিল্লাত যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু কায়েদে আজমের মত গুরু গম্ভীর ও দুর্জয় কঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোককে হাতের কাজ রেখে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলার মত সাহস ও অধিকার একমাত্র মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ ব্যতীত আর ত কারুর ছিল না।

বলতে গেলে প্রায় জোর করেই তিনি কায়েদে আজমকে বিশ্রাম নিবার জন্যে রাজধানী করাচী থেকে দূরে জিয়ারতে নিয়ে গেলেন।

এ ঘটনা হল ১৯৪৮ সালের জুন মাসের! অল্প কয়েকদিন সেখানে বিশ্রাম নিবার পরে দেখা গেল সত্যই কায়েদে আজমের শরীর অনেকটা সামলে উঠেছে। সে সময়ে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নূতন ভবন তৈরী হয়ে গেল।

কায়েদে আজম উদ্বোধনী ভাষণ লিখিয়ে নিতে শুরু করলেন।

ভাষণটি তৈরী হওয়ার পরে ভয়ে ভয়ে এ, ডি, সি (নৌবহর) নিবেদন করল ঃ শরীরের এই অবস্থা নিয়ে আপনি এখন করাচী সফর না করে ভাষণটি প্রধান মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি নিজে পড়ে শুনিয়ে দেবেন।

কায়েদে আজম তাকে কোনও জওয়াব না দিয়ে হাতের ইশারায় বাইরে যেতে বল্লেন।

এই ঘটনার দু'দিন পরে মাদারে মিল্লাতকে সাথে নিয়ে কায়েদে আজম কোয়েটা এলেন। এবং সেখান থেকে করাচী রওয়ানা হলেন। পয়লা জুলাই স্টেট ব্যাংক ভবন উদ্বোধনের কথা ছিল।

ফিরবার সময়ে দেখা গেল ঃ

কায়েদে আজম অনেক বেশী ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

এমন কি হাঁটতেও পারছেন না। ফলে তিনি শয্যাগত হয়ে পড়লেন।

ফেলে আসা দিনগুলো

হারানো দিনের স্মৃতি উল্লেখ করে মাদারে মিল্লাত বলেন ঃ

'ইন্তেকালের কয়েক বছর আগে থেকেই চিকিৎসক এবং কায়েদে আজমের মধ্যে টানা হেঁচড়া শুরু হয়েছিল।

চিকিৎসকগণ তাঁকে সতর্ক করে বল্লেন ঃ

এখন হতে কাজের মাত্রা কমিয়ে বিশ্রামের পরিমাণ বাড়িয়ে নিন।'

কিন্তু কায়েদে আজম তাদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত করতে লাগলেন।

আমি যখনই তাকে বলতাম ঃ

একটু সময় করে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিন।

এর জওয়াবে তিনি আমাকে হামেশা এ কথাই বলতেন ঃ

'আমার অনেক কাজ রয়েছে। বরবাদ করবার মত সময় আমার কাছে নেই।'

কিন্তু দুর্বলতা এত বেশী বেড়ে গেল যে শেষ পর্যন্ত কায়েদে আজম আদরের বোন ফাতিমার কাছে আত্মসমর্পন করলেন।

এবারেও মাদারে মিল্লাত তাঁকে জিয়ারতে নিয়ে গেলেন।

লাহোর থেকে কর্নেল ইলাহী বখশ মরহুমকে (প্রিন্সিপাল, এডওয়াড কলেজ) ডেকে পাঠালেন।

চিকিৎসকগণ কায়েদে আজমকে যথারীতি পরীক্ষা করলেন।

মাদারে মিল্লাতকে যখন লেবরেটরী টেস্ট রিপোর্ট শোনাচ্ছিলেন, তখন তিনি ধীর স্থিরভাবেই তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকলেন। ডাক্তারগণ পরিষ্কার দেখতে পেলেন ঃ

ধৈর্য, মনোবল, দৃঢ় সঙ্কল্প ও সহিষ্ণুতা এসব গুণ মহান ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি পুরোপুরি অর্জন করেছেন। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রোগের অবস্থা বিস্তারিতভাবেই জেনে নিলেন।

পরে যখন ডাক্তারগণ তাঁরে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন ঃ

জাতির জনক কায়েদে আজমের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই তারা করবেন। এতে কোনও রকম গাফলতি হতে তারা দেবেন না !

মাদারে মিল্লাত ডাক্তারদের কথা শুনে হতাশ হয়ে সোফার উপরে এলিয়ে পড়লেন।

তিনি ধরা গলায় বল্লেন ঃ 'হায় আফসোস। ভাইয়া যদি আমার কথা আগেই মেনে নিতেন।'

দেখা গেল ঃ মাদারে মিল্লাতের চোখে ঢল নেমে এসেছে। তিনি কাঁদছিলেন।

অতন্দ্র প্রহরা

এ যাবত মাদারে মিল্লাত একাই কায়েদে আজমের সেবা শুশ্রূষা করে আসছিলেন।

কিন্তু এবারে একজন নার্স মোতায়েন করা হল। কয়েকদিন পরে ডাক্তারদের কাছে সেই নার্সটি বল্ল ঃ

'মাদারে মিল্লাত সারা রাত জেগে কাটান। বার বার তিনি খিড়কী পথে উঁকি দিয়ে দেখে নেন, কায়েদে আজম কেমন আছেন।

যখনই তিনি দেখতেন ঃ কায়েদে আজম অস্বস্তি বোধ করছেন, তখনই মাদারে মিল্লাত কায়দে আজমের কাছে এসে নিজ হাতে অক্সিজেন দিতে থাকতেন।'

ডাক্তারগণ তাঁর আদর্শ সেবা শুশ্রূষা দেখে খুবই মুগ্ধ হলেন। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন ঃ

এত দুর্বল ক্ষীণকায় মহিলাটি দিন রাত একাকার করে দিয়ে এভাবে এত পরিশ্রম করছেন কিভাবে ? আর বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যায় না কেন ?

যে পথের শেষ নেই

জিয়ারতের আবহাওয়া তেমন খাপ খেল না।

সেই জন্যই ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করে মাদারে মিল্লাত তাঁকে নিয়ে কোয়েটায় এলেন।

সেখানে আসার পরেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটল না। দুর্বলতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

তাই দেখে ডাক্তারগণ পরামর্শ দিলেন—করাচী নিয়ে আসার জন্য।

একদিন তারা মাদারে মিল্লাতকে বল্লেন ঃ

> 'যদি কোনও বিস্ময়কর ঘটনা দেখা না দেয়, তবে আর কায়েদে আজম দু'তিন দিনের বেশী বাঁচবেন, তেমন আশা করা যায় না।'

কিন্তু মাদারে মিল্লাত ডাক্তারদের কথায় সায় দিতে পারলেন না। তিনি বল্লেন ঃ

'কায়েদে আজমের শরীরের অবস্থা ত এর আগেও অনেকবার বার এর চাইতেও যে অনেক বেশী খারাব হয়েছে।

অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মাদারে মিল্লাত অত্যন্ত সংকট জনক অবস্থায় কায়েদে আজমকে নিয়ে করাচী এলেন।

কিন্তু তিনি সে রাতেই ১০-২৫ মিঃ আল্লাহ পাকের দরবারে গিয়ে হাজির হলেন (ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলায়হি রাজেউন)।

মাদারে মিল্লাত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাশের কামরায় পড়ে থাকলেন।

দাফন কাফনের পর দিন ডাক্তারগণ যখন ফাতেহাখানি ও শোক প্রকাশের জন্য এলেন, তখন মাদারে মিল্লাত জানতে চাইলেন:

কায়েদে আজম শেষ মুহূর্তে কি বলেছেন ? তাঁর মুখের শেষ কথাটি কি ছিল ?

ডাক্তারগণ যখন বল্লেন, তিনি শুনে ছোট শিশুর মতই কেঁদে

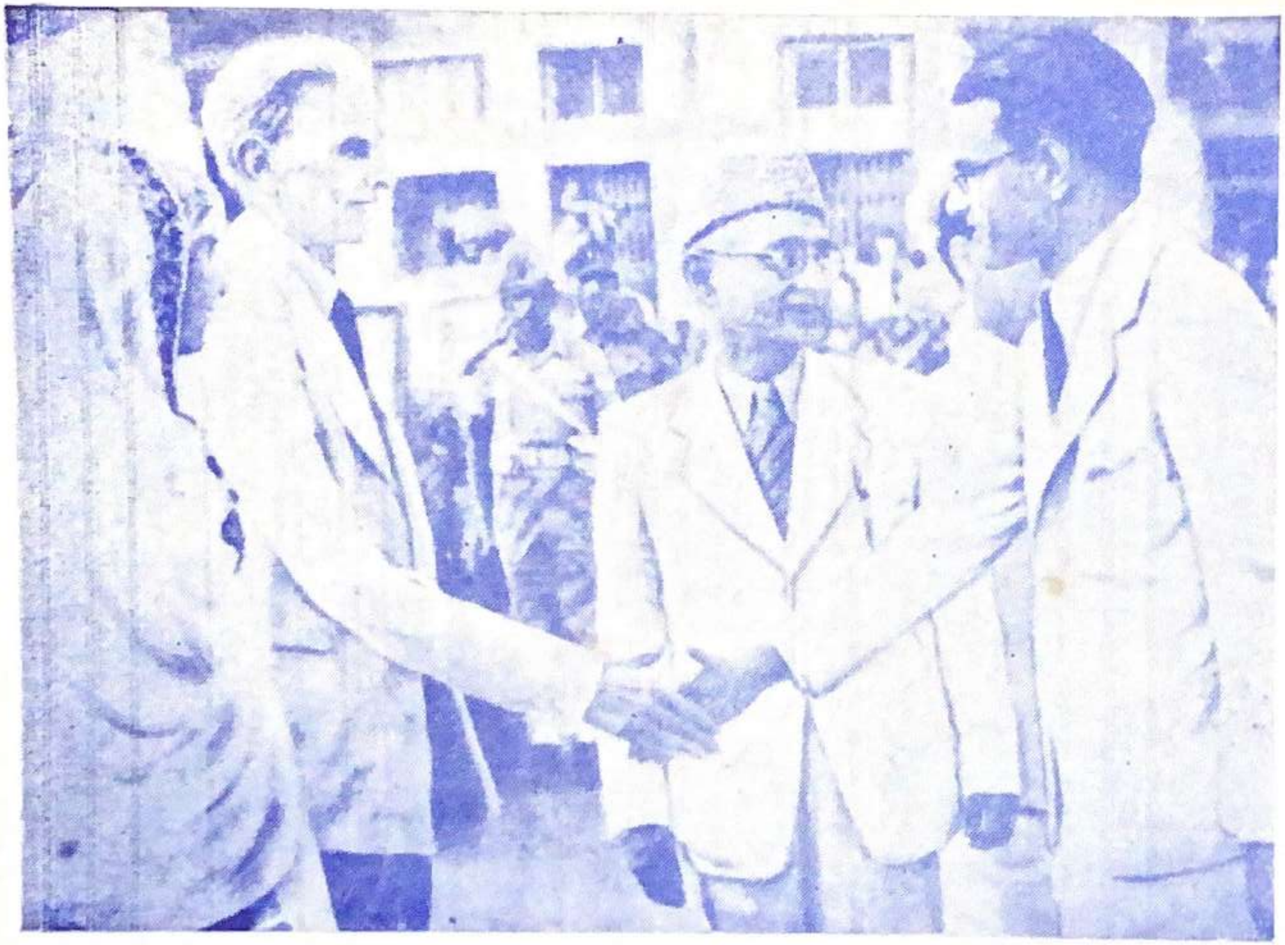

কায়েদে আজমের জীবদ্দশায় তোলা সর্বশেষ চিত্র

মাদারে মিল্লাত, কায়েদে আজম, তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনকে দেখা যাচ্ছে। : মাদারে মিল্লাত :

উঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন : এখন আর আমি বেচে থেকে কি করব ?

ভাইয়ার স্মৃতি : ভাইয়ার ডাক

কায়েদে আজমের ইন্তেকালের কিছু দিন পরে মাদারে মিল্লাত একবার বলেছিলেন :

> 'মৃত্যু শুধু তাঁর শোকার্ত বেদনাহত একটি বোনের কাছ থেকেই তাঁকে ছিনিয়ে নেয় নি। বরং লক্ষ কোটি জনতার শোকাশ্রু ও আহা জারি উপেক্ষা করে আমাদের কাছ থেকে তাঁকে কেড়ে নিলে। নইলে তাঁর জন্য জান কোরবান করতে শুধু তার বোনই একা নয়, বরং গোটা কওম সে জন্য প্রস্তুত। হায়! তেমন যদি সম্ভব হত।'

মাদারে মিল্লাত—কায়েদে আজমের শুধু একটি একান্ত অনুগত বোনই নন। বরং তিনি তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য বন্ধু, আদর্শ পরামর্শ দাতা এবং সুদক্ষ ব্যবস্থাপক ছিলেন। এই দুটি ভাই-বোনের মধ্যে মতের অমিল খুব কমই হয়েছে।

কিন্তু যখনই তেমন কিছু ঘটেছে, তখন দেখা গেছে : আদরের ছোট বোন মুখ ভার করে সেখান থেকে উঠে নিজের কামরায় গিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছেন।

কিছুক্ষণ না যেতেই ভাইয়ার ডাক শোনা যেত :

'ও ফাতমী! এ দিকে একটু এসো।'

সাড়া না পেলে সেই কায়েদে আজম—যিনি দুনিয়ার কোনও ব্যক্তিত্বের সামনে কিছু মাত্র নরম হতে জানতেন না, তিনি নিজে উঠে গিয়ে মাদারে মিল্লাত ফাতেমা জিন্নাকে রাজী করতেন।

'আমি আর আমার বোন—এই ত মুসলিম লীগ'

কায়েদে আজম নিজের এই ছোট্ট বোনটির নিস্বার্থ সেবা, অক্লান্ত পরিশ্রম, নির্মল ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধায় এতখানি মুগ্ধ ছিলেন যে,

একবার তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গেও বল্লেন :

'আসলে মুসলিম লীগ বলতে এখনও কি বুঝায় ? আমি আর আমার বোন—এই ত।'

কায়েদে আজম ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে মোটেই আস্থাবান ছিলেন না। আর তিনি চাটুকারিতাও মোটেই পসন্দ করতেন না। তাঁর চিন্তাধারা ও কথা-বার্তা বিবৃতি বক্তৃতা সব কিছুই যে শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা সূত্রের মতই অটল অনড় ছিল।

১৯৪৭ সালের ৯ই আগষ্ট মরহুম স্যার গোলাম হোসেন হেদায়তুল্লাহ করাচী ক্লাবে কায়েদে আজমকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক বিরাট ভোজ সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে মান-পত্রের জওয়াব দিতে গিয়ে হঠাত তিনি নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বর্জন করে নানা প্রসংগে আলোচনা শুরু করলেন।

সব শেষে তিনি মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার খুব প্রশংসা করে বল্লেন :

'দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমি যখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ঘরে ফিরতাম, তখন আমার বোন ফাতেমা আলো এবং আশার উজ্জল শিখার মতই আমাকে ঘিরে রাখত।

এই বোনটি যদি আমার দেখা শুনা না করত, তা হলে আমার দুশ্চিন্তা কতগুণ যে বেড়ে যেত, আমার স্বাস্থ্য যে কতখানি বিগড়ে যেত সে কথা আমি ভাবতে পারি না। সে কখনও কার্পণ্য করে নি। কখনও কোনও অভিযোগ করে নি। আজকে আমি আপনাদের কাছে এমন একটা ঘটনার কথা বলব, যা আপনাদের মধ্যে হয়ত অনেকেরই জানা নেই।

এমন এক সময় এসে ছিল। যখন আমরা নিদারুণ সমস্যা সংকট ও বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। এমন কি গোলাগুলি ও মৃত্যু আমাদের জন্য অবধারিত বলে মনে হত। আমরা অবশ্য যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত ছিলাম।

কায়েদে আজমের জন্ম দিবস উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট হাউসে
মেহমানদের অভ্যর্থনারত মাদারে মিল্লাত।
: মাদারে মিল্লাত :

ডেরাইসমাইলখান শহরে আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনারত নাগরিকগন।
: মাদারে মিল্লাত :

কিন্তু আমার এই বোন ফাতেমা একটি শব্দও মুখে আনে নি। বরং
সে আমাকে সাহস দিয়েছে। উৎসাহিত করেছে।
পরো দশটি বছর ধরে সে আমার পাশে পাশেই রয়েছে। আমার
অন্যতম বিশ্বস্ত, অনুগত নির্ভরযোগ্য ভরসার পাত্রী সেই
ছিল। আমাকে সে সামলে রেখেছে।'

অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমাই এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী---যিনি আজীবন কায়েদে আজমের একান্ত বিশ্বাসের পাত্রী ছিলেন।

এমন গৌরব অর্জনের সৌভাগ্য বলতে গেলে আর কারুরই দেখা যায় না।

কায়েদে আজম যখন নিজের মনের বোঝা হালকা করতে চাইতেন, তখন বিনা সংকোচে খোলা মনে সব কিছু আদরের বোন ফাতেমা জিন্নার কাছেই বলতেন। এমন কোনও বিষয় ছিল না, যা নাকি মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার কাছে গোপন থাকত।

আর তিনিও সেই বিপুল আস্থার কিছুমাত্র অসম্মান কোনও দিন করেন নি। কায়েদে আজম যে কথাই তাঁর কাছে বলতেন, তা তিনি বুকের মধ্যে সযত্নে রেখে দিতেন।

এ কি কম কথা! কায়েদে আজমের মত বিরাট ব্যক্তিত্বশালী ক্ষণ-জন্মা মহান জননায়কের জন্য এমন নির্ভরযোগ্য সহযোগির প্রয়োজন যে কত বেশী ছিল, সে কথা জ্ঞানবান অভিজ্ঞ লোকদের মধ্যে কাউকে বুঝিয়ে বলার আবশ্যক নেই।

তিনি তা পেয়েছিলেন।

আদরের বোন মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাই হলেন সেই সুমহান গৌরবের অধিকারিনী।

'ফুল কাউন্সিলে পেশ করবে, এখন যাও'

জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কখনও কোনও বিবৃতি আদরের বোন ফাতেমা জিন্নাকে না দেখিয়ে, তাঁর মতামত না জেনে প্রচারের জন্য পাঠাতেন না।

তিনি সেক্রেটারীদেরকে বলতেন : 'বিবৃতির খসড়া 'ফুল কাউন্সিলে' পেশ করবে।

তার মানে ছিল : তিনি নিজে আর মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ।

'মুসলিম নারী-সমাজের মুক্তি দূত'

মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার সমাজ সেবার কথা কায়েদে আজম বড়ই দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

১৯৪৭ সালে ডিসেম্বর মাসে রয়াল স্কটিশ অফিসারদের প্রদত্ত ভোজসভায় মাদারে মিল্লাতকে সাথে নিয়ে যোগদান করেন।

ফিরতি পথে তিনি স্বীয় মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল ই, সেণ্ট, জে, বি, বার্নকে আপন বোনের সুদীর্ঘ সাহচর্যের কথা বর্ণনা প্রসংগে বল্লেন :

কি ভাবে তিনি (মাদারে মিল্লাত) নারী সমাজের নেতৃত্ব দান করছেন।

মহিলাদের মুক্তি অর্জনে তাঁর ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিপীড়িত নির্যাতিত মজলুম মুসলিম ভারতের মুক্তি ও আজাদীর জন্যে যেভাবে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তিনি যেভাবে দিন রাত একাকার করে অনগ্রসর, অসাড়, অচেতন মুসলিম জনগণের মধ্যে নব জীবনের জোয়ার এনে ছিলেন, তাঁরই অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ যুগ যুগান্তের

পঞ্জীভূত ঘন ঘোর আঁধারে আচ্ছন্ন গতি হীন, শক্তি হীন, আধমরা সত্য বলতে কি জীবন্ত লাশ আমাদের মা বোনদের মধ্যে যে ভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছেন—ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

কোটি কোটি মজলুমের প্রাণে আশার সঞ্চারকারী কায়েদে আজম ও মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহের চেষ্টা সাধনা ও আদর্শের প্রতি অবিচল ও নিরংকুশ নির্মল নিষ্ঠা আল্লাহ তায়ালা উপেক্ষা করতে পারলেন না। বরং তিনি খুশী হয়ে আদর্শ নিষ্ঠ সৎকর্মীদের জন্য যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পুরা করলেন।

পাকিস্তান দুনিয়ার বুকে বাস্তব রূপ নিল।

কত বাধা, কত বিঘ্ন এল—কিন্তু সবই শূন্যে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু যে অশুভ শক্তি দুর্নীতি ও অনাচার এবং স্বৈরাচারের অন্ধ গলিপথ বেয়ে মুসলিম ভারতের পিঠে ছুরিকা হেনে ছিল। মুসলমানদের সংঘ-শক্তি নির্মূল করে দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির আসন থেকে তাদেরকে ছলে বলে কৌশলে পথে নামিয়ে দিয়েছিল। তাদেরই বংশধর তৎকালীন ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন চরম ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করল।

সে নিজ দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে, ন্যায়নীতির মুণ্ড পাত করে বড়ই জঘন্য উপায়ে পক্ষপাত শুরু করে দিল। যার ফলে মুসলিম ভারতকে অকারণে বহু ক্ষয় ক্ষতি বরদাশত করতে হয়েছে—নিজেদের জন্মগত অধিকার আজাদী লাভের বিনিময়ে। আর নবজাত রাষ্ট্র পাকিস্তানকে এজন্য বেশুমার বাধা বিঘ্ন ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়েছে সম্পূর্ণ অহেতুকভাবে—শুধু এই লোকটির পক্ষপাত দুষ্ট আচরণের ফলে।

ভারত বিভাগের পরিকল্পনা এমনভাবে কার্যকরী করা হল যাতে মুসলমানরাই সব বিষয়ে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হল। এভাবে কায়েদে আজমের কাঁধে বিপুল দায়িত্বের বোঝা এসে পড়ল। এক দিকে মাউণ্ট ব্যাটেনের ষড়যন্ত্র কারসাজির ফলে যে সকল সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিয়েছে সে সবের প্রতিরোধ প্রতিকার করা, অপর

দিকে মোহাজিরগণের পুনর্বাসন, সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি জরুরী বিষয়ে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদনে তাঁকে দিন রাত ব্যস্ত থাকতে হল! মোট কথা সব রকমের সুযোগ সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত অবস্থায় তাঁকে সব রকমের দুশমনদের মোকাবিলায় দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হয়েছিল।

কায়েদে আজম চৌষট্টি বছর বয়সে পাকিস্তান প্রস্তাব কার্যকরী করার বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। আর মাত্র সাত বছরের মধ্যেই তিনি সমগ্র জাতিকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌছে দিলেন। আবার একাত্তর বছর বয়সের এই বুড়ো লোকটির উপরেই পাকিস্তানকে মজবুত বুনিয়াদের উপরে কায়েম করার মত গুরুতর দায়িত্ব এসে পড়ল। কায়েদে আজম অকাতরে সেই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

কিন্তু নিজের বোঝা একটু হালকা করার জন্য সামাজিক পর্যায়ে জাতি গঠনের নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব তিনি মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার উপরেই ন্যস্ত করলেন।

আরও কঠিন বোঝা

বলা বাহুল্য কায়েদে আজমের এই সিদ্ধান্ত যে কত বাস্তব ও সুদূর প্রসারী ছিল, আজকের দিনে সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই আশা করি।

মাদারে মিল্লাত—যিনি কায়েদে আজমের প্রতিনিধিত্ব তাঁর জীবদ্দশায় সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছেন, আজকে তিনিই দেশ ও জাতিকে দুর্নীতি, অনাচার ও স্বৈরাচারের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য সিংহিনীর বেশে ময়দানে এসে পড়েছেন।

আরাম তিনি হারাম করলেন

সে যাই হোক মাদারে মিল্লাত একটি মুহূর্ত বিলম্ব না করে ময়দানে নেমে পড়লেন। গোটা কওমকে তিনি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি

করার জন্য আহ্বান জানালেন। পাকিস্তানের মা বোনদেরকে নূতন দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। পুঞ্জীভূত সমস্যার মোকাবিলার জন্যে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য তিনি ডাক দিলেন।

১৯৪৭ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে দেশের মা বোনদেরকে লক্ষ্য করে তিনি ঘোষণা করলেন :

> 'সামাজিক কল্যাণ, চিকিৎসা সাহায্য, শিশু কল্যান ও স্বাস্থ্য-রক্ষা —এ সব বিষয় অনেকের কাছেই তেমন জরুরী কাজ বলে গণ্য হচ্ছে না। অথচ এগুলি অত্যন্ত জরুরী কাজ। কারণ এ সবের উপরেই যে কোনও জাতির ভবিষ্যত মজবুত বুনিয়াদের উপরে কায়েম হতে পারে।'

লাহোর সফর ঃ কঠিন শপথ গ্রহণের আহ্বান

মাদারে মিল্লাত কায়েদে আজমের সাথে লাহোর সফরে এলেন। সেখানকার অবস্থা তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ করলেন।

১৯৪৭ সালের ২রা নবেম্বর তারিখে রেডিও পাকিস্তানের লাহোর কেন্দ্র হতে প্রচারিত বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন :

> 'আমি লাহোরে আসার পরে মোহাজিরগণের বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি। বিভিন্ন হাসপাতাল, এতিম খানা, নারী কল্যাণ কেন্দ্র, কুটির শিল্প কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করেছি। অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দুর্গতদের শোচনীয় দুঃখ দুর্দশার করুণ কাহিনী, তাদের উপরে যে সব বীভৎস পৈশাচিক অত্যাচার হয়েছে তার লোম হর্ষক বিবরণ আমি শুনেছি—যা আমাদের মা বোন ও ছোট্ট কচি শিশুদের উপরে নরপিশাচরা করেছে। আমরা এত ভয়ানক বিপদের জন্য বলতে গেলে মোটেই তৈরী ছিলাম না। আচমকা এই সব বিপদ আমাদের উপরে এসে পড়েছে। এক্ষণে আমরা নিজেদের জাতীয় ইতিহাসের অত্যন্ত সংকটময় অধ্যায়ের সম্মুখীন রয়েছি।

আমরা জাতীয় ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় রচনা করতে অগ্রসর হয়েছি ।

আসুন ! আমরা জাতীয় রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য সম্ভাব্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি মোটেই করব না—আজকে আমাদেরকে এই শপথ নিতে হবে।'

শুধু কথা নয় ঃ বাস্তব আদর্শ

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ শুধু কায়েদে আজমের আদরের বোনই নন। বলতে গেলে তিনি একাধারে কায়েদে আজমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, একান্ত নির্ভরযোগ্য ও সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতম প্রতিনিধিও বটেন ।

শুধু কায়েদে আজমের জীবদ্দশাতেই নয়, বরং আজ পর্যন্ত এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে একান্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। কোনও রকম স্বার্থ, সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য না করে, শুধু নিষ্ঠার সাথে নির্বিকার ভাবেই তিনি নিজ কর্তব্য সমানে পালন করে আসছেন ।

সে কথা—কাহিনী বা ইতিহাসের উপকরণ নয়, বরং তাই যে আমাদের ইতিহাস।

সে কথা কেউ কোনও দিন অস্বীকার করতে সক্ষম হবে না। পাকিস্তানের মা বোনদেরকে সমাজ সেবায় আত্ম-নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মাদারে মিল্লাত শুধু বক্তৃতা ও বিবৃতির উপরে নির্ভর করাটা কোনও দিন পসন্দ করেন নি। বরং তিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সাধনার মারফতে পাকিস্তানের নারী জাতির জন্যে অপূর্ব অতুলনীয় বিস্ময়কর গৌরবময় আদর্শ কায়েম করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি ঃ পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সাথে সাথেই মোহাজিরদের পুনর্বাসন সমস্যা যে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল, আর মাদারে মিল্লাত সেই

গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা যে ভাবে করেছেন, তার বিবরণ সামনে রাখলে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সবার মাথা নুয়ে আসে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্না এ সম্পর্কে স্বীয় সহকর্মীদের এবং নিজের কর্মতৎপরতার যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে দেখা যায় :

'১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান বাস্তব রূপ নিল। আর সেই সংগে সংগে আমাদের দুশমনগুলো সুসংবদ্ধ ভাবে নিদারুণ হামলা করে বসল। ভারতের মুসলিম নাগরিকদের একটি বিরাট অংশের উপরে যে ভাবে শোচনীয় পাশবিক অত্যাচার নির্যাতন করা হল, বিশ্বের ইতিহাসে তার কোনও নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পাশবিক হামলার ফলে দলে দলে আশ্রয় প্রার্থী পাকিস্তানে আসতে লাগল। এই লোমহর্ষক কাণ্ডের খবর যখন করাচীতে পৌছাল, তখন সবাই শোক বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল। উদ্বেগ অশান্তির ঝড় বয়ে গেল।

এই খবর পাওয়ার সংগে সংগেই নেতৃস্থানীয়া মুসলিম মহিলাদেরকে ডেকে একটি কমিটি কায়েম করলাম। সেই দিনই বিকাল বেলা গবর্নমেণ্ট গার্ডেনে মহিলাদের একটি সাধারণ সভার ব্যবস্থা করলাম। সেখানে আমার আবেদনে প্রায় সাত হাজার টাকা চাঁদা হিসেবে জোগাড় হল।'

মহিলাদের রিলিফ কমিটি

মহিলাদের নিয়ে পরিচালিত রিলিফ কমিটির কর্মতৎপরতার বিবরণ উল্লেখ করে মাদারে মিল্লাত বললেন :

'৩ হাজার টাকা মূল্যের ঔষধ পাঠানো হল। ড্রিগ রোডে মোহাজিরদের জন্য একটি কেন্টিন খোলা হল। খাবার জিনিসপত্র জোগাড় করে টিনের কৌটায় ভর্তি করে দিল্লীর মোহাজির ক্যাম্পে পাঠান হল।

আমাদের কর্মীগণ দিনে দুবার করে ট্রানজিট ক্যাম্পে হাজির হয়ে মা বোন ও শিশুদেরকে কাপড় বিতরণে সাহায্য করতে লাগলেন।

করাচীর ক্যাম্প যখন ভর্তি হয়ে গেল, তখন আমরা মোহাজিরদের সাধারণ অবস্থা ও রোগ ব্যধির প্রতিকার ব্যবস্থা তদারক করার জন্য একটি আলাদা কমিটি গঠন করলাম।

অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে বেগম শাবান, বেগম ইয়াকুব ও বেগম আনসারীকে নিয়ে একটি প্রতিনিধি দলকে সিন্ধু এলাকার মোহাজিরদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হল।

এই প্রতিনিধি দলটি হায়দরাবাদ, লাড়কানা, শিকারপুর, জেকব আবাদ এসব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করলেন। নগদ টাকা পয়সা ও কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করলেন। স্থানীয় জনসাধারণকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বল্লেন—যেন মোহাজির ভাইবোনদের সাথে তারা খুব ভালো ব্যবহার করেন।'

হিসাব নিকাশের দায়িত্ব

মাদারে মিল্লাতের উদ্যোগে মহিলাদের যে রিলিফ কমিটি কায়েম করা হয়েছিল, তার হিসাব নিকাশ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি নিজেই সেই হিসাব জনসাধারণের কাছে পেশ করেছেন। তাতে দেখা যায় :

'মহিলাদের এই রিলিফ কমিটির কাছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬ শত ৯৮ টাকা চাঁদা বাবদ সংগৃহীত হয়। তা থেকে ৯৮ হাজার ৮ শত টাকা কায়েদে আজম রিলিফ ফাণ্ডে জমা দেয়া হয়েছে। ২ হাজার টাকার উল কিনে নিয়ে তা দিয়ে সোয়েটার বুনিয়ে বিতরণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৭ শত পশমী কম্বল, ২ হাজার গজ গরম কাপড়, ৭ শত পশমী সোয়েটার, ৩ শত ওয়েষ্ট

কোট, ২ শত ৯০টি সাধারণ কম্বল, ৩ শত লেপ লাহোরে পাঠানো হয়েছে।

আর ১ হাজার ৩ শত ৭৫টি কম্বল, ৫০টি লেপ, ৬ শত ওয়েষ্ট কোট, ৭ শত পশমী ও সূতী সোয়েটার এবং ১১ হাজার ২ শত ৭৮ খানা বস্ত্র সিন্ধু এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে।

শীতের মওসুম এসে পড়ায় পশ্চিম পাঞ্জাব এলাকায় আরও ১১ হাজার নূতন লেপ তৈরী করে পাঠানো হয়েছে।’

পূর্ব পাকিস্তানেও সমস্যার ভীড়

পশ্চিম পাকিস্তানের মতই পূর্ব পাকিস্তানেও নানা বিধ সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বিশেষ করে মুসলমানদের যে সব দুশমন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথে হর হামেশা বাধা দিয়ে এসেছে, তারা এক্ষণে উঠে পড়ে লাগল যাতে পাকিস্তান অকাল-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও মোহাজের সমস্যা ও সীমান্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল গুরুতর ভাবে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্য কত শত চেষ্টাই না শুরু হল।

এক দল জোর গুজব ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল : পশ্চিম পাকিস্তান এখান থেকে অনেক দূরে, অথচ হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানের উপরে আক্রমণ করল আর কি! বেশী দেরী নেই। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক সাহায্য পৌছানর আগেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। মোট কথা নানা ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টা সমানে চলতে লাগল।

কায়েদে আজম পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শন করতে এলেন। তিনি দেশের উভয় অংশের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ মজবুত করে গেলেন।

দায়িত্ব-সচেতন মাদারে মিল্লাত

দেশ ও জাতির এই গুরুতর সংকট মুহূর্তে যখন কায়েদে আজম দিনরাত অবিরাম পরিশ্রম করছেন, তখন মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ পাকিস্তানের নারী সমাজকে কর্মতৎপর করে তোলার জন্য নিজের সাধ্য শক্তি মোতাবেক সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন।

ঢাকার বুকে মাদারে মিল্লাত

১৯৪৮ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে ঢাকায় প্রদত্ত মহিলা মুসলিম লীগের তরফ থেকে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় মানপত্রের জওয়াবে মাদারে মিল্লাত জোর দিয়ে বল্লেন :

'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই।' দেশের উভয় অংশের মধ্যে ঐক্য মজবুত করার জন্য মহিলা প্রতিনিধি দলের শুভেচ্ছা সফরের প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করেন।

চাটগাঁয়ে মাদারে মিল্লাত

২৬শে মার্চ তারিখে চাটগাঁয়ের এক অনুষ্ঠানে মহিলাদেরকে আহ্বান জানালেন :

'আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে, আর সময় না কাটিয়ে অবিলম্বে সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে এগিয়ে আসা। গোড়ার দিকে কাজের পরিমাণ যত সামান্যই হোক না কেন, কাজ অবশ্যই শুরু করতে হবে।'

জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ

পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষ করে তিনি এক বেতার ভাষণে দেশের নারী সমাজের কাছে আবেদন জানালেন :

'পাকিস্তানের এখন বিপুল সংখ্যায় সমাজ-কর্মী, শিক্ষিকা, লেডী ডাক্তার, নার্স—এ সব দরকার। দেশরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণের জন্য নারী সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য তাদেরকে সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে।'

এ সব প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করার পরে মাদারে মিল্লাত আরও বল্লেন :

'এ ছাড়া আরও একটি কাজ এমন রয়েছে, যাতে আপনারা (পাকিস্তানের নারী সমাজ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। তা হচ্ছে : দেশের উভয় অংশের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন মজবুত করা।'

তেজোদৃপ্ত ঘোষণা

মাদারে মিল্লাত দেশবাসীকে সতর্ক থাকার জন্য বল্লেন :

'দুশমনরা চায় আমাদের মধ্যে বিভেদ বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে, নানা রকম বিরোধ বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল করে ফেলতে। আপনার সবাই ঐক্য বদ্ধ থাকুন। এবং নিজেদের লক্ষ্য থেকে তিল মাত্র বিচ্যুত হবেন না।'

সীমান্তের পাঠান মুল্লুকে

পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ মজবুত করার উদ্দেশ্যে কায়েদে আজম ব্যাপক সফর শুরু করেন। মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ মহান ভাইয়ের সাথে কাঁধ মিলিয়ে জাতিগঠনের কাজে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। তিনিও এই সফরে অন্যান্য বারের মতই কায়েদে আজমের সাথে ছিলেন।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে সীমান্ত প্রদেশের মহিলা মুসলিম লীগের তরফ থেকে প্রদত্ত মানপত্রের জওয়াবে মাদারে মিল্লাত দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

'এক্ষণে আমাদের সামনে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দাঁড়িয়েছে —দেশের বুনিয়াদ আমরা কিভাবে মজবুত করে তুলব ?

আপনারা স্মরণ রাখবেন : মহিলা সমাজ দেশের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। একথা সত্য যে আমাদের টাকা পয়সা ও দরকারী উপকরণের অভাব রয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত আকারে যত ছোট হোক না কেন—কাজ অবশ্যই শুরু করা। ধীরে ধীরে সে কাজ এক দিন বিপুলতা অর্জন করতে পারবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

জাগো, পুর নারী সবে জাগো !

১৮ই এপ্রিল (১৯৪৮) পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত এক বিরাট মহিলা সমাবেশে মাদারে মিল্লাত মা বোনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন :

'পাকিস্তানকে মজবুত বুনিয়াদের উপরে গড়ে তুলতে আপনারা এগিয়ে আসুন! এ ক্ষেত্রে আপনাদের উপরে যে বিরাট কর্তব্য রয়েছে, তা স্মরণ করে দেখুন। নিজেদের কর্তব্য পালনে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। দেশের শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ণের কাজে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে এগিয়ে আসুন।

আপনারা মজবুত সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যান—দেখবেন আপনারা অনেক কাজ বেশ সুষ্ঠু ভাবেই সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছেন।'

'আমাদের আশা ও ভবিষ্যত শিশুদের ডাকে সাড়া দিন'

১৯৪৮ সালের জুন মাসে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত শিশুদের কল্যাণ প্রচেষ্টায় তৎপর হওয়ার জন্য মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লেন :

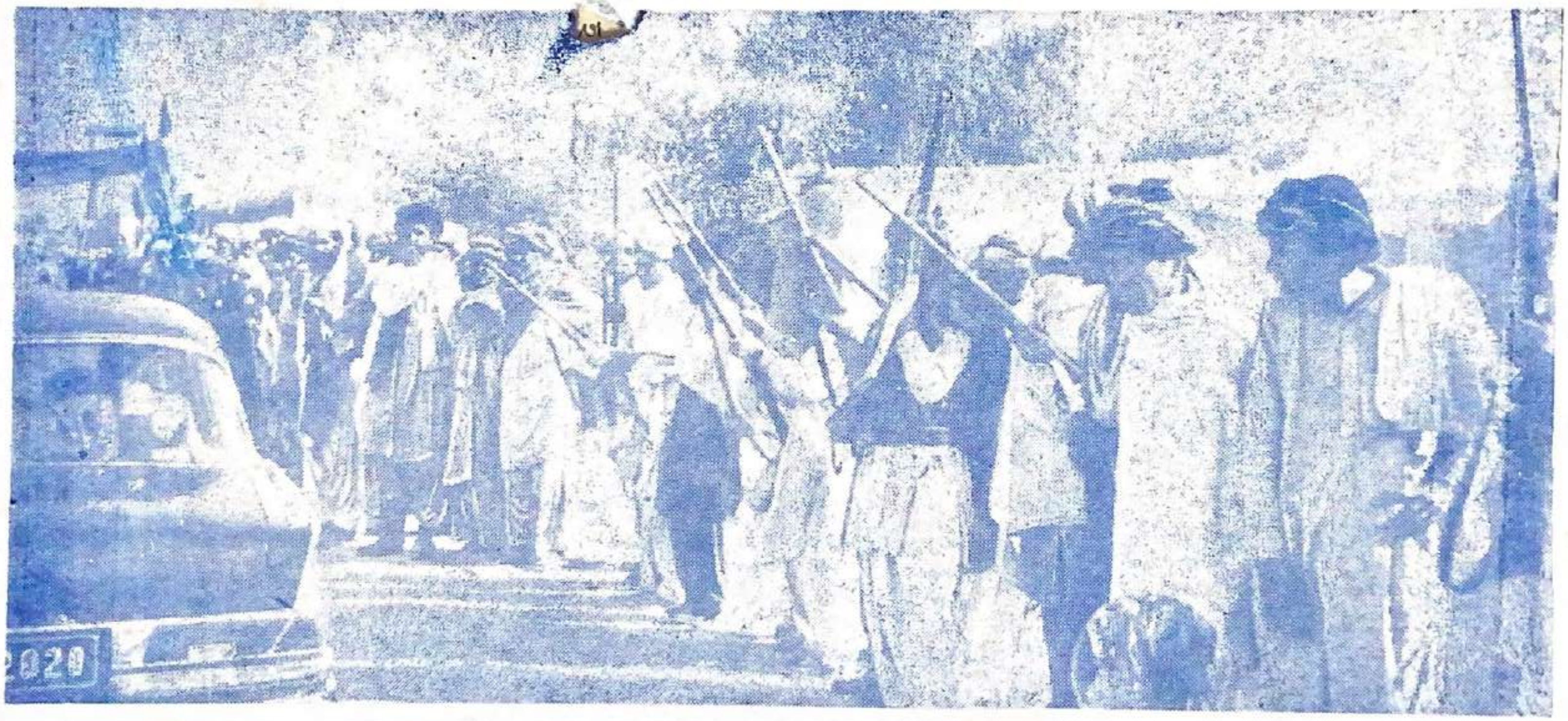

বান্নুর রাইফেলধারী জনতা মাদারে মিল্লাতকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে।

'দেশের এই যে হাজার হাজার শিশু—যারা নিদারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে, এরাই ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের আশা ও ভবিষ্যতের মালিক। আমাদের উচিত এদের ডাকে সাড়া দেয়া।

আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা পেলে এরা নিশ্চয়ই এক নয়া জিন্দেগীর পরশ লাভে ধন্য হবে। এদের বিমর্ষ মলিন মুখে আশার উজ্জ্বল আলোক প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে।'

কোয়েটা সফর

১৯৪৮ সালের জুন মাসে মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ কোয়েটা সফরে যান। সেখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট মহিলা সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করলেন :

'আপনাদের কতব্য হচ্ছে, বিধবা ও নিরাশ্রয় মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী হতে, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা। এতিমখানা, প্রসূতি সদন ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া আবশ্যক।

আপনারা হয়ত বলবেন সেই অতি পুরাতন কথা : আমাদের হাতে টাকা নেই, আমাদের কর্মী নেই। কিন্তু আমি বলব : একথা সঠিক নয়। কারণ টাকা পয়সার ব্যবস্থা ত যে কোনও সময় হতে পারে।

আসলে আমাদের যা দরকার, তা হল এই যে আমাদেরকে এমন একটি দল তৈরী করতে হবে, যারা নিঃস্বার্থ ভাবেই অক্লান্ত পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। এখন আমাদের এই দেশ বড়ই কঠিন দুর্যোগ অতিক্রম করছে। এক্ষণে দরকার :

আপনার নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্ম ত্যাগ

'বিশ্রাম নেবার কিংবা আরাম করার সময় এ নয়।'

চরম বিপর্যয়ের ঘনঘটা

মাদারে মিল্লাত দিন রাত দেশ ও জাতি গঠনের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন ।

হঠাৎ করাল ব্যাধির আক্রমণে মুসলিম ভারতের মুক্তি দাতা, আদরের ছোট্ট বোন ফাতেমার বড় ভাইয়া শয্যাগত হয়ে পড়লেন । আর তিনি সব কিছু ভুলে গিয়ে ভাইয়ার সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করলেন ।

আল্লাহ হয়ত পাকিস্তানীদের ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলেন ! তাই তিনি কায়েদে আজমকে নিজের কাছে তুলে নিলেন । আর শোকার্ত বোন ও বেদনা কাতর জাতি চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিল ।

শোকার্ত জাতির কাছে এসে দাঁড়ালেন

এই পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জন সাধারণ যে বিপুল কোরবানী ও ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জন করল । নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য দেশের জনগণ যে ভাবে দুঃখ বিপর্যয় অকাতরে বরদাশ্‌ত করেছে, তা শুধু একটি জিনিসের বিনিময়ে ।

জাতির কাছে সান্ত্বনার সম্পদ ছিলেন কায়েদে আজম ।

তাঁকে এক নজর দেখতে পেলে, তাঁর কণ্ঠস্বর একটি বার শুনতে পেলে সব দুঃখ, সব যাতনা নিমিষে দূর হয়ে যায় ।

সমগ্র জাতি এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন ছিল । চার দিকে কেবল সমস্যার ভীড় জমে উঠল ।

এই কঠিন দুর্যোগ মুহূর্তে আল্লাহ পাক দেশের জনগণকে দায়িত্ব সচেতন করে গড়ে তুলতে, দুর্জয় সাহসের সাথে যে কোনও সমস্যার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার জন্যই হয়ত কায়েদে আজমকে তুলে নিলেন ।

১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তানের বুকে সেই মহা বিপর্যয় নেমে এল।

জাতির ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল।

আশার স্বপ্ন ভেংগে খান খান হয়ে গেল।

হতাশার ঘনঘটা নেমে এল।

দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে কায়েদে আজমের সম্পর্ক ছিল নেতা আর জনতার। কিন্তু এই বন্ধন এমনই অপূর্ব ছিল যে তার তুলনা কোথাও মিলে না। কায়েদে আজমের ইন্তেকালেও দেশবাসী এমনই শোকাহত হল, ততখানি শোক বোধ হয় কারুর কোনও অতি ঘনিষ্ঠজনের মরনেও হয় না।

একটু চিন্তা করলে সবাই অনুভবকরতে পারবেন, তখন মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল।

তিনি কি শুধু কায়েদে আজমের আদরের ছোট বোন ?

যিনি প্রায় ৫৪ বছর ধরে ঠিক মায়ের মত আদর যত্ন করেছেন কায়েদে আজমকে।

এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কায়েদে আজম ঘরে বাইরে ছোট বড় যেখানে যত কাজ করেছেন তাতে মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাকে আমরা দেখতেপাই ঠিক কায়েদে আজমের পাশে তাঁরই ছায়ার মত।

ভাই বোনের মধ্যে এমন সম্পর্ক আর ত কোথাও দেখা যায় নি।

ভাইয়ের মৃত্যুতে বোন নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

সোয়েমের দিন চিকিৎসকগণ তাঁকে পরামর্শ দিলেন যেন তিনি নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেন। ডাক্তারদের কথা শুনে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আর ভাঙ্গা গলায় বল্লেন : 'এখন আর বেঁচে আমি কি করব ?

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ ছাড়া আর কোনও মহিলা এত বড় দুর্যোগ বিপদের ধাক্কা কিছুতেই সামলে উঠতে পারত না।

কিন্তু তিনি হলেন কায়েদে আজমের অতি আদরের বোন। তাঁরই স্নেহ-ছায়ায় প্রতিপালিতা। উঠা বসা, চলা ফেরা, চিন্তা ও অনুভূতি ইত্যাদি সব কিছুই যে তাঁরই কাছে শিখেছেন।

তাই এই চরম দুর্যোগ মুহূর্তেও তাঁরই চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল।

তাই ত দেখা গেল ঃ নিজের শোকের বোঝা এক পাশে ঠেলে রেখে মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ আট কোটি শোকার্ত দেশবাসীর কাছে এসে দাঁড়ালেন! নিজের চোখের পানি মুছে ফেল্লেন। তিনি দেশবাসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন ঃ

'কায়েদে আজম বেঁচে থাকতে আমি যেভাবে দেশ ও জাতির খেদমত করে এসেছি—তাঁর ইন্তেকালের পরেও পাকিস্তানকে মজবুত বুনিয়াদের উপরে গড়ে তুলতে—যা তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সে জন্য আমার চেষ্টা সাধনা আমি অক্ষুণ্ন রাখব। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি ঃ এ জন্য আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি করব না। মরহুম কায়েদে আজমের স্বপ্ন সাধ বাস্তবে পরিণত হোক। আমার বাকী জীবনেও এই উদ্দেশ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটবে না।'

'কায়েদে আজম বেঁচে নেই ঃ কিন্তু তাঁর রূহ বা আত্মা আমাদের সাথেই রয়েছে'

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ বল্লেন ঃ

'পাকিস্তানের জনক আজকে আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। কিন্তু আমি এ কথা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি ঃ তাঁর রূহ বা আত্মা আমাদেরই সাথে রয়েছে!'

জনগণের দুর্জয় মনোবল

আরেকবার তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

'কায়েদে আজমের ইন্তেকালে দেশ ও জাতির উপরে যে ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে এল, তার ধাক্কা সামলে উঠা মোটেই সোজা কথা

নয়। কিন্তু জাতি সে আঘাত অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে, সাহসের সাথে সামলে উঠল।

আপনারা জাতির জনক কায়েদে আজমকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন—এক মাত্র তাঁরই মহান ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করে। আপনারা সবাই সততা, নিষ্ঠা ও ঈমানদারীর সাথে দেশের খেদমতে আত্ম নিয়োগ করুন।'

পাকিস্তানের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে জনগণের হাতে

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ ঘোষণা করলেন :

'আমি আপনাদের আগ্রহ উৎসাহ পূর্ণ মনোভাবের প্রশংসা না করে পারছি না। আমি বেশ পরিষ্কার ভাবেই অনুভব করছি : আপনারা কায়েদে আজমকে কতখানি ভালবাসেন। আপনারা তাঁর প্রতি এই ভালোবাসার প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন শুধু এভাবেই : তিনি যে নীতি অনুসরণ করেছেন, আপনারাও সেই নীতি মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরবেন। পাকিস্তান আপনারা হাসিল করেছেন কিন্তু তার হেফাজত করার দায়িত্ব আপনাদের উপরেই রয়েছে। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব আপনাদের হাতেই রয়েছে।'

স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা আপনাদের আছে কি ?

মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ আবার ঘোষণা করলেন :

'আপনারা স্মরণ রাখবেন : এই পাকিস্তান আপনাদের কাছে বড়ই দুর্লভ আমানত। লাখো জানের কোরবানীর বিনিময়ে এই পাকিস্তান হাসিল করা সম্ভব হয়েছে। সারা বিশ্বের চোখ আপনাদের দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে। আপনাদেরকে প্রমাণ দিতে হবে যে আজাদীর হেফাজত ও নিরাপত্তা বিধানে

আপনারা সক্ষম। একটি মুহূর্তের জন্যও এ কথা আপনাদের ভুলে থাকা চলবে না যে এই পাকিস্তান হাসিলের জন্য কায়েদে আজম বড়ই কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তার পরে যখন পাকিস্তান কায়েম হল, তখন তিনি পাকিস্তানের বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য আগের চাইতে অনেক বেশী পরিশ্রম করেছেন। তিনি অবশ্য এভাবে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করেছেন। কিন্তু নিজ জানের বিনিময়ে! কায়েদে আজম বেঁচে ছিলেন শুধু পাকিস্তান হাসিলের জন্য আর তিনি নিজের জান কোরবান করলেন, তাও যে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের জন্যই।'

শোক নয়—কর্ম প্রেরণা

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ উলকার মত ছুটে গেলেন শোক বিহ্বল দেশের প্রতিটি কন্দরে কন্দরে। তিনি জনগণমনে শোকের বদলে দায়িত্ব বোধ জাগিয়ে তুল্লেন।

তিনি যদি সেই কঠিন দুর্যোগ মুহূর্তে অসীম ধৈর্য ও সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে এসে জাতির পাশে না দাঁড়াতেন; তা হলে না জানি দেশ ও জাতির দুশমনরা সেই দুর্বল মুহূর্তে কি সর্বনাশই না ঘটিয়ে দিত! মাদারে মিল্লাত দেশবাসীর কাছে ছুটে এলেন ঘোরতর বিপদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে।

মায়ের ডাক

মাদারে মিল্লাতের কণ্ঠে শোনা গেল:

'শোন তোমরা! এ যে বড়ই কঠিন পরীক্ষার সময়! তোমরা সবাই হুশিয়ার থাকবে। দেখ, তোমাদের পা যেন পিছলে না যায়। তোমাদের সংকল্প যেন অটল অনড় থাকে। কঠিন ঝঞ্ঝার সাথে তোমাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে। উদ্দেশ্য হাসিলের আগে, মঞ্জিলে পৌঁছানর আগেই যেন তোমাদের গতি স্তব্ধ হয়ে না যায়।'

লাহোরে মাদারে মিল্লাতের সাথে ছাত্র প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতকার ।

: মাদারে মিল্লাত :

আমাদের আজাদীর প্রতীক নবজাত রাষ্ট্র পাকিস্তান তখন যে কঠিন দুর্যোগের মধ্যে ছিল, তখন যদি কিছু মাত্র ভুলভ্রান্তি ঘটত, তা হলে না জানি কি নিদারুণ অবস্থাই দেখা দিত! মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ সেই সংকটজনক অবস্থা পুরোপুরি আঁচ করতে পেরেছিলেন।

তাই তিনি ১৯৪৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে দেশের তরুণ যুবকদেরকে আহ্বান জানালেন:

'আমাদের নওজোয়ানদের উচিত দলে দলে সৈন্য বিভাগে যোগদান করা। তারা মাতৃভূমির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসুক।

তোমরা সবাই একথা স্মরণ রাখবে: যে কোনও দেশের গৌরব সম্মান নির্ভর করে সে দেশের জনগণের কম-তৎপরতার উপরেই। যে দেশের জনসাধারণ শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়, সে দেশ নিশ্চয়ই দুর্বল হয়ে পড়বে। এভাবেই দুর্বল দেশগুলি বাইরের আক্রমণের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে।

লড়াইয়ের ময়দানে জয়লাভের জন্য অস্ত্র শস্ত্র হাতিয়ার সাজ সরঞ্জামের প্রাচুর্য ও প্রাধান্য তেমন বেশী প্রয়োজনীয় নয়, যতখানি দরকার উচ্চাকাংখা ও ঈমানের শক্তির। আমরা হাজার হাজার যুদ্ধের ময়দানে দেখেছি:

সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মুসলমানরা সব রকমে সুসজ্জিত সেনা বাহিনীর মোকাবিলায় জয়লাভ করেছে। মুষ্টিমেয় মুসলিম মুজাহিদরা হাজার হাজার শত্রুকে কোনঠাসা করে রেখে দিয়েছে।

মাদারে মিল্লাত পাকিস্তানী নওজোয়ানদেরকে ইতিহাস থেকে সেই শিক্ষা নিতে আহ্বান জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন :

'কায়েদে আজম আমাদেরকে সম্মানিত মুসলিম জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিশ্ববাসীকে তিনি দেখিয়ে গেছেন : মুসলমানরা যখন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কোনও কাজে হাত দেয়, তখন দুনিয়ার কোনও শক্তি তাদেরকে রুখতে পারে না। এগিয়ে তারা যাবেই

ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে মুসলমানরা সব জায়গাতেই বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতে সক্ষম।

আপনাদের প্রিয় কায়েদে আজম দুনিয়ার বুকে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

অনেকেই পাকিস্তানের সম্পদ সামগ্রীর দিক থেকে হতাশা বোধ করছেন। কিন্তু তোমরা সবাই স্মরণ রাখবে পাকিস্তানের চাইতে বড় সম্পদ শক্তি হচ্ছে—ঈমান। তোমরা এই ঈমানের জোরেই দুনিয়ার বুক কাঁপিয়ে তুলতে পারবে।'

মাদারে মিল্লাত শোকার্ত পাকিস্তানী জনগণকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বরাবর স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন।

১৯৪৯ সালের ১২ই জুন তারিখে কায়েদে আজমের মাজারে দাঁড়িয়ে জাতির কাছে আহ্বান জানালেন :

'ওঠো তোমরা! নিজেদের অটুট মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাও। তোমার যে ভাই দাঁড়িয়ে থাকার মত শক্তি রাখে না, তাকে সামাল দাও। যে ভাই তোমার অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে, তাকে সজাগ করে দাও। তোমরা সবাই স্মরণ রাখবে : পাকিস্তান তোমাদের অমূল্য সম্পদ—লাখো জান ও মাল কোরবানীর বদলে এই পাকিস্তান হাসিল হয়েছে। পাকিস্তানকে নিয়ে, পাকিস্তানের ইজ্জত ও সম্ভ্রম নিয়ে কোনও শত্রুকে খেলা করতে তোমরা দিও না। তোমাদের শিরায় শিরায় প্রতিটি ধমনিতে আত্ম-সম্মান, ও আজাদীর শোণিতধারা প্রবাহিত হোক।

[illegible]

[illegible]

শহীদানের কথা তোমরা স্মরণ কর

সংকট সমস্যা যত বড়, যত বিরাটই হোক না কেন সে সবের মোকাবিলা সাফল্যের সাথে করতে হলে সবার আগে চাই ঐক্য! জাতীয় জীবনের সকল স্তরে ঐক্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে সবার আগে। মাদারে মিল্লাত সে কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি দিনরাত পাকিস্তানী জনগণের কাছে সেই বিরাট কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন!

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তৎকালীন দুর্বল নেতৃত্বের কুফল হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্তরে সংকীর্ণতার বিষ ছড়িয়ে পড়ছিল। মাদারে মিল্লাত তাই দেখে দেশের জনগণকে এর মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন:

'তোমরা স্মরণ রেখ! আমাদের বীর শহীদানরা যখন দুশমনদের হাতে নিজেদের জীবন দান করেছে, তখন কিন্তু তারা একটি বারও একথা ভাবতে পারে নি যে তারা কোন এলাকা, কোন প্রদেশ বা কোন শহরের বাশিন্দা। তাদের সামনে ছিল শুধু ইসলাম আর পাকিস্তান। এই জন্যই তারা নিজেদের জান হাসি মুখে কোরবান করেছে।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকগণ! তোমরা যদি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে চাও, তা হলে এই মুহূর্তে তোমরা সব রকমের বিভেদ বিদ্বেষ ধুয়ে মুছে নিজেদের মন-মস্তিষ্ক সাফ করে নাও।'

জনগণই তাঁর একান্ত আপন জন

কায়েদে আজমের ইন্তেকালের পরে পুরো একটি বছর ধরে জাতির মনোবল মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য, কায়েদে আজমের বাণী জনগণের অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তিনি ছুটে বেড়ালেন। তা দেখে মনে হচ্ছিল: তিনি যেন আদরের বড় ভাইয়াকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

কোটি মানুষের মনে মুখে চেহারায় যেন তাঁর বড় ভাইয়ার স্মৃতিই পরিস্ফুট রয়েছে!

তা দেখবার মত চোখ একমাত্র মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নারই রয়েছে!

তিনি ছাড়া সে সৌভাগ্য আর কারই বা হতে পারে!

কায়েদে আজমের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যখন তাঁর মন শোক বেদনায় ভারাক্রান্ত—তখনও তিনি যে ভাবে অজেয় মনোবলের পরিচয় দান করলেন, সত্যই তা গৌরবের বস্তু।

তিনি সেখানে বল্লেন:

'কায়েদে আজমের ইন্তেকালে গোটা কওম নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ কারুর মনে বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু আমার জন্য এ যে কত বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার মত শক্তি আমার নেই। যদি দেশবাসী জনগণ আমাকে এ সময়ে নিজেদের বুকে-মনে আশ্রয় না-ই দিত, তাহলে এই নিদারুণ আঘাত আমি কিছুতেই বরদাশত করতে পারতাম না। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করেছি। শহর, গ্রাম, পথ-ঘাট, হাট-মাঠ, বন-জংগল, পাহাড় পর্বত সব খানেই ত কায়েদে আজম ও পাকিস্তানের জয়ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে। দেশের জনগণ আমাকে যেভাবে তাঁদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়েছে, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি।'

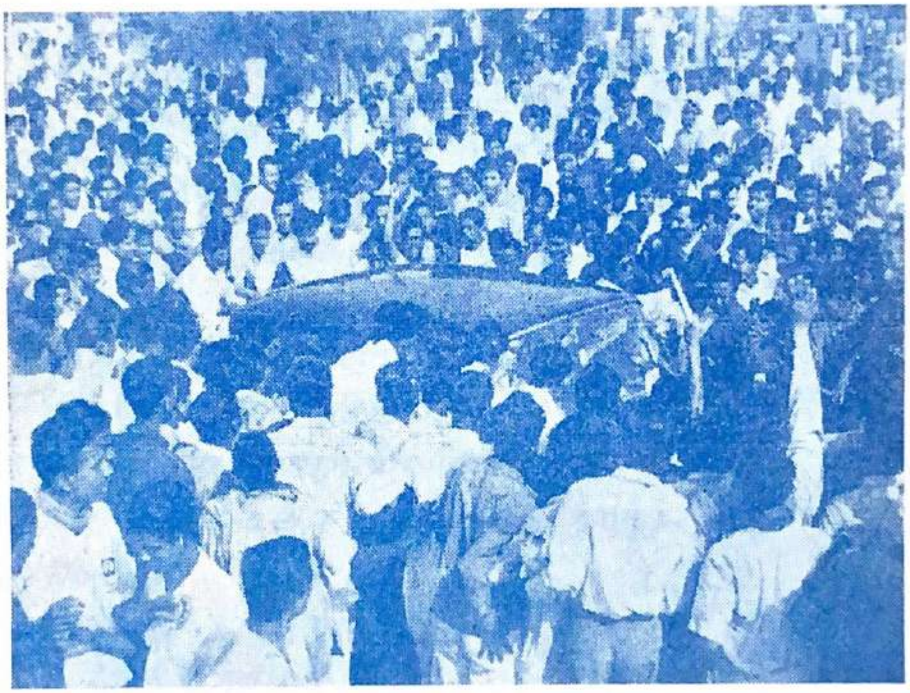

ঢাকার বিপ্লবী তরুন যুব সমাজ মাদারে মিল্লাতের গাড়ীখানাকে
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। : মাদারে মিল্লাত :

এর পরে মাদারে মিল্লাত যখন বল্লেন :

'আজকেও আমি যখন আমার বড় ভাইয়ের সুদীর্ঘ কালের সাহচর্য থেকে বঞ্চিতা, তখনও আমি দেখতে পাচ্ছি : পাকিস্তানের জনগণ আমাকে ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা ভক্তির চোখে দেখছে, যত খানি তারা কায়েদে আজমের জিন্দেগীতে আমাকে ভালোবেসেছে, সম্মান দেখিয়েছে।'

জনগণই তাঁর শক্তির মূল উৎস

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ যখন বল্লেন :

'জনগণের ভক্তি ভালোবাসাই আমাকে জীবনী শক্তি দান করেছে। এরই ফলে আমি নিজেকে বেশ শক্তিশালী ও কর্মঠ মনে করছি। এখন আমি বেশ ভরসা পাচ্ছি যে জীবনের বাকী কটা দিন দেশ ও জাতির সেবায় এবং কায়েদে আজমের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনে আত্ম-নিয়োগ করতে সক্ষম হব।'

মাদারে মিল্লাতের এ কথা শুনে উপস্থিত সবার মন বিচলিত হয়ে উঠল।

সবারই চোখ ছলছল করে উঠল।

সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য!

পাকিস্তানের জনগণকে এতখানি আপন ভাবতে পারে তেমন কেউ আছে কি?

আর দেশের জনসাধারণ যাঁকে নিজেদের বুক মন উজাড় করে দিয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান জানাতে পারে, তেমন আর কেউ আছে কি?

দেশের সবাইকে এই প্রশ্নের জওয়াব অবশ্যই দিতে হবে। এই জওয়াবের উপরেই দেশ ও জাতির সত্যকার আজাদী, সম্মান নির্ভর করছে।

জাতীয় জীবনে নূতন সূর্য !

আমাদের এই পাকিস্তান গণশক্তির সফল প্রতীক।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা নানাভাবে একেবারে শুরু থেকেই চেষ্টা চালিয়ে এসেছে—যাতে সমাজ সভ্যতার অবদান গণতন্ত্রের সুফল থেকে পাক-ভারত উপ মহাদেশের কোটি কোটি মুসলমান জনসাধারণ চির দিন বঞ্চিত থাকে। আর তাদের ভাগ্য নিয়ে, তাদের বিষয় সম্পদ নিয়ে গুটি কতক শয়তানের তাবেদার যেন চিরকাল ধরে ছিনি মিনি খেলতে পারে !

কিন্তু আমাদের কায়েদে আজম রুখে দাঁড়ালেন।

তিনি পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

তিনি ডাক দিলেন।

তাঁর ডাকে নির্যাতিত বঞ্চিত ভাগ্য-বিড়ম্বিত কোটি কোটি মুসলিম নর-নারী সাড়া দিল। তারা মরণ পন নিয়ে এগিয়ে এল। তাদের সংঘ-শক্তি গণ দুশমণদের কারসাজি ভণ্ডুল করে দিল।

শয়তানী চক্রের বিভীষিকা

দুনিয়ার বুকে পাকিস্তান কায়েম হল।

কিন্তু শয়তানী চক্রের পিশাচবৃত্তি নিরস্ত হল না ! জনগণের আশা আকাঙক্ষার প্রতীক পাকিস্তানকে ঘায়েল করার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগল। মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে, বিষাক্ত বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করে জনগণ-মন নিস্প্রভ, নিশ্চল, গতিহীন করে তুলবার জন্য, আশার বদলে হতাশার বিষ ছড়িয়ে দেবার জন্য সব চেষ্টাই তারা করল। কিন্তু আজাদীর কাফেলা এগিয়ে গেল মুক্তির পথে, জিন্দেগীর পথে। কাফেলার গতি থামল না।

গণ দুশমনরা বল্ল : 'পাকিস্তান পাগলের উদ্ভট স্বপ্ন মাত্র।'

গণবিরোধী চক্র বল্ল : 'পাকিস্তান ত পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মতই ক্ষণ স্থায়ী।'

প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝাও যখন দুনিয়ার বুক হতে পাকিস্তানের নকশা মিটিয়ে ফেলতে পারল না, তখন গণ দুশমনদের আসল চেহারা প্রকাশ পেল।

তারা মানবতার মুখোশ খুলে ফেলে দিয়ে বর্বর পিশাচ মূর্তি ধারণ করল।

তখনকার একটি ঘটনা :

একখানা যাত্রী-বাহী ট্রেন পূর্ব পাঞ্জাব এলাকা পেরিয়ে পাকিস্তানের সীমানায় প্রবেশ করল। ট্রেন খানা ধুঁকতে ধুঁকতে এসে থামল। যেন সারা পথ কত শত দুর্যোগ তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে। রেল ষ্টেশনে স্বেচ্ছা সেবকগণ হাতে খাবার নিয়ে, কাঁধে পানির ডোল নিয়ে উপস্থিত ছিল। তারা সবাই গাড়ীর দিকে ছুটল। কিন্তু তারা অবাক হয়ে গেল! গাড়ীর দরজা খুলে কিংবা খিড়কী দিয়ে কেউ তাকাচেছ্ না। গাড়ীতে যেন জীবিত কেউ নেই। ----

তখনকার সেই চরম দুর্যোগপূর্ণ শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করে মাদারে মিল্লাত বলেছেন :

'তখনও আজাদী লাভের আনন্দ কোলাহল থামে নি। এরি মধ্যে লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ ও শিশু বৃদ্ধকে বাস্তুভিটা হতে তাড়িয়ে দেয়া হল। তারা বয়ে আনল লক্ষ লক্ষ নিস্পাপ মজলুমানের হাহাকার ফরিয়াদ। এই সব ভাগ্য হত, বিড়ম্বিত মানুষের দল যাদের পেটে অন্ন নেই, যাদের মন আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ছিল--তারা বেশুমার লাশ পেরিয়ে নিস্তব্ধ নিথর হতাশার বুক চিরে পাকিস্তানের পথ ধরে এগোতে লাগল। তারা অত্যন্ত অসহায় অবস্থার মধ্যেই পাকিস্তানে আসতে লাগল। কায়েদে আজম তখনও বেঁচে ছিলেন। তাই দুশমনদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেল।'

দেখতে না দেখতে পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় অসংখ্য মোহাজির ক্যাম্প গড়ে উঠল।

কিন্তু মোহাজিরদের আগমন বন্ধ হল না!

তাদেরকে নিজেদের বাস্তু ভিটায় বহাল রাখার মত কেউ ছিল না।

তবে কি পাকিস্তানে আসার পরে তাদেরকে সাহায্য এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার হিসাবে অনেক কিছুই করার মত কাজ ছিল।

বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী

মাদারে মিল্লাত তাদের অবস্থা দেখে চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি এই সব ভাগ্য বিড়ম্বিতদের সেবা সাহায্যের কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন। এবং এক্ষেত্রে তিনি এক অতুলনীয় আদর্শ কায়েম করলেন।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উইমেন্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোমের উদ্বোধনী ভাষণে মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করলেন:

'বাস্তু হারা মোহাজিরদের মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে অসহায় শিশু আর বিধবা মা বোনেরা। তাদেরকে দেখাশোনা করবে এমন কেউ নেই। আমি স্থির করেছি: তাদের জন্য এমন একটি সংস্থা কায়েম করতে হবে—যেখানে তাদের থাকা খাওয়া এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। আমি সে জন্য চেষ্টা তদবীর শুরু করলাম। অবশেষে সরকার আমাকে এই কাজের জন্য এই বাড়ী খানা দিয়েছেন। আমি আশা করি সরকার আমাদেরকে অর্থ সাহায্যও করবেন। এখানে আমাদের বিপন্ন মা বোনদেরকে কুটির শিল্প ও সেলাইয়ের কাজ শেখান হবে। যেন তারা সম্মান-জনক জীবন যাপনে সক্ষম হতে পারেন। তারা যেন বুঝতে পারেন যে কারুর উপরে বোঝা হয়ে তারা বেঁচে নেই।'

গবর্নমেন্ট হাউস, না রিলিফ ক্যাম্প!

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার অল্প দিন পরেই শীতের মওসুম এসে পড়ল।

মাদারে মিল্লাতের নির্দেশ মোতাবেক কয়েক হাজার টাকার উল খরিদ করা হল। আর মেয়েদের মধ্যে যারা সোয়েটার বুনতে পারে তাদেরকে আহ্বান জানান হন।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এত স্বেচ্ছা সেবিকাদের জন্য বসতে কোথায় জায়গা দেয়া যায়!

মাদারে মিল্লাত গবর্নমেন্ট হাউসের প্রস্তাব দিলেন। তখন গবর্নমেণ্ট হাউসের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল:

এক দিকে কায়েদে আজম নিজের ষ্টাফ নিয়ে সরকারী কাজে ব্যস্ত। আর উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ আসা যাওয়া করেছেন।

অপর দিকে মাদারে মিল্লাত স্বেচ্ছা সেবিকাদের নিয়ে মোহাজিরদের জন্য সোয়েটার বুনছেন। লন, বারান্দা ও ছাদে লেপ বিছিয়ে নিয়ে মহিলা কর্মী-দল দরকার মত টুকটাক কাজ সেরে নিচ্ছেন। কায়েদে আজম এই দৃশ্য দেখে কতই না খুশী হতেন!

মোহাজিরদের জন্য ক্যাম্প খোলার পর থেকে মাদারে মিল্লাত নিয়মিত সে সব ক্যাম্পে গিয়ে সব কিছু দেখা শুনা করতেন। মাদারে মিল্লাত যখন যেখানে যেতেন, যাদের সাথে তাঁর আলাপ হত, তিনি তাদেরকে মোহাজিরদের সেবা সাহায্যের কাজে অংশ নিবার জন্য উৎসাহ দিতেন।

কায়েদে আজমের ইন্তেকালের পরে মাদারে মিল্লাত যখন লাহোরে আসেন, তখন তিনি 'কসরে ইসতিকলাল' এ অনুষ্ঠিত এক সম্বর্ধান সভায় বল্লেন:

> 'আমি দেখতে পাচ্ছি, হাজার হাজার নিরাশ্রয় অসহায় মেয়েছেলে নিজেদের ছোট ছোট শিশু সন্তান কোলে নিয়ে পথে ঘাটে হয়রান পিরেশান অবস্থায় ঘুরে কাটাচ্ছে। তাদের খোঁজ খবর নিবার মত কেউ নেই। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে যে কোনও রকমের হাতের কাজ শেখানর ব্যবস্থা করে দেয়া। যেন তারা সম্মানিত জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করতে পারে। আপনারা এমন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ ও আত্ম বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারেন।'

অসহায় দুস্থদের কল্যাণের জন্য এই ধরনের শিল্প সংস্থা গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে তিনি দিন রাত পরিশ্রম করতে লাগলেন।

করাচীতে শমা'লেডীজ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

'আমি চাই শুধু করাচীতেই নয়, বরং পাকিস্তানের প্রতিটি জনপদে এ ধরনের সংস্থা গড়ে উঠুক।'

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ দুস্থ মোহাজিরদের পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি মোটেই করেন নি। তার নজরে এই বিষয়ের সব দিক বেশ সুস্পষ্ট ছিল।

তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত ইকবাল দিবসে সভা-নেত্রীর অভিভাষণে এই সমস্যার মারাত্মক দিক সম্পর্কে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘোষণা করলেন ঃ

> 'মোহাজিরদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, দুর্বিসহ, বড়ই বেদনা দায়ক! এত বিপুল সংখ্যক লোকের বেকার অবস্থায় ভবঘুরের মত কাটান দেশের জন্য বড়ই অমঙ্গল জনক!'

স্বেচ্ছা সেবক, নাগরিক এবং সরকারী কর্মচারীদের তৎপরতার ফলে ধীরে ধীরে বস্তীসমূহ গড়ে উঠতে লাগল। সাময়িক ক্যাম্পগুলিও খালি হয়ে আসল।

মোহাজিরদের সামনে ছিল নূতন ভাবে জীবন যাপনের নানাবিধ

জটিলতর সমস্যা আর নিজেদের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে নিদারুণ অনুভূতি।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ক্লিফটন রোডের উপরে ১৮০ খানা কোয়ার্টার সমন্বয়ে একটি নূতন কলোনী গড়ে উঠল। মাদারে মিল্লাত সেই কলোনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে হতাশ মোহাজির-দেরকে নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক সচেতন হতে উদ্বুত করলেন। তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন:

> 'যত দিন এই সর্বহারা মোহাজিরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন আমাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি হাসিল হতে পারে না। হয়ত এদের মধ্যেই ইসলামের ও পাকিস্তানের সত্যকার সেবক ও সাধক পয়দা হবে।'

পরে যখন মোহাজির সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করলেন, মাদারে মিল্লাত তাই দেখে নিরস্ত হলেন না মোটেই। বরং তিনি এ জন্য বরাবর সচেষ্ট রয়েছেন।

কায়েদে আজম রিলিফ ফাণ্ডে অর্থ সংগ্রহের জন্য সাধ্য-শক্তি মোতাবেক চেষ্টা করতে থাকলেন। সেই সংগে তিনি জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ এবং সরকারী বিভাগ সমূহের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদারক করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় আজাদী দিবস উপলক্ষে মাদারে মিল্লাত দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন:

> 'আজ হতে আমরা আজাদীর তৃতীয় বছরে পদাপন করলাম। কিন্তু এখনও অনেক জরুরী সমস্যার সমাধান আমরা করে উঠতে পারি নি। আশ্রয়হীন লোকদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। এই বিষয়টির গুরুত্ব খুব বেশী। সাহস এবং সঠিক দৃষ্টি ভংগী নিয়ে আমাদের সব কাজ করা দরকার। যতক্ষণ এই সমস্যার সমাধান না হবে, ততক্ষণ আমাদের পক্ষে বিশ্রাম নেয়া মোটেই উচিত হবে না।

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ যখন যেখানে মোহাজিরদের অবস্থা কিছু মাত্র খারাব দেখেছেন, তিনি তাতে অস্থির হয়ে পড়েছেন।

প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই : ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ একবার লাহোরে আসলেন। সেখানে তিনি বল্লেন :

> 'আমি যখন সফরে বের হই, তখন আমি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পূর্ণ শ্লোগানের পেছনে মানুষের দুঃখ বেদনায় পরিপূর্ণ হাহাকার ধ্বণিও যে শুনতে পাই। তাও যে আমার কানে আসে। আর তাতে আমার মন অস্থির হয়ে উঠে। পথে আমি কতগুলো শিশুকে দেখলাম, তারা ভিক্ষা করছে। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় তারা পথে ঘাটে ঠোকর খেয়ে বেড়াচেছ যদি সময় মত ওদের শিক্ষা দীক্ষার সুব্যবস্থা করা না হয়, তা হলে এই সব শিশু এক দিন দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার কারণ সব রকমের অপরাধ অভাব অনটনের কোলেই লালিত পালিত হয়ে থাকে।'

তার পরে মাদারে মিল্লাত যখনই দেখতে পেয়েছেন যে সরকারী কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না, তখনই তিনি গর্জন করে উঠেছেন :

> 'এ সব এতীম অসহায় শিশু যারা শহরে বন্দরে পথে ঘাটে ভিক্ষা করে বেড়াচেছ, ভবঘুরের মত সময় কাটাচেছ এরা আমাদের সামাজিক জীবনের কলংক বটে। কিন্তু এ জন্য দায়ী সরকারী কর্ম-কর্তারাই।'

মাদারে মিল্লাতের তীক্ষ দৃষ্টি থেকে জাতীয় জীবনের কোনও সমস্যাই এড়াতে পারে নি। তিনি যখন দেখলেন : স্থানীয় এবং মোহাজির এই নামে আরেকটি বিষাক্ত ছুরিকা জাতির বুকে বিদ্ধ হতে যাচেছ, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সংগে সংগে তিনি জাতিকে হুঁশিয়ার করে দিলেন।

১৯৪৯ সালের ১২ই জুন শাবে-বারাত উপলক্ষে কায়েদে আজমের মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করলেন :

'লক্ষ লক্ষ মুসলমান চরম নির্যাতনের মুখে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে আসছে। আর লোক জন তাদেরকে মোহাজির বলে আখ্যা দিয়েছে। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পষ্ট করে বলে দিচ্ছিঃ দুনিয়ার সব বিপদ আপদ দুঃখ ক্লেশ মাথা পেতে নিয়ে যারা এখানে আসছে তারা মোহাজির নয়, কিছুতেই নয়। তোমরা স্মরণ রেখ : কায়েদে আজম পাকিস্তান হাসিল করেছিলেন যাতে মুসলমানরা এমন একটি আশ্রয় খুঁজে পাবে যেখানে তারা নির্বিঘ্নে এবং আবরু ইজ্জত মান সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। মুসলমানরা সেই আশ্রয় লাভ করেছে পাকিস্তান নামে পরিচিত একটি ভূখণ্ডে। যে কেউ এখানে বসবাস করার জন্য আসবে সে-ই পাকিস্তানী বলে গণ্য হবে। আজ থেকে মোহাজির ও স্থানীয় এসব কথা একেবারে খতম করে দিতে হবে। ভুলে যেতে হবে।'

এর পরেই দেখা গেল প্রাদেশিকতার বিষফোঁড়া জাতির দেহ মনকে বিষিয়ে তুলছে। তিনি নির্বিকার থাকতে পারলেন না।

মাদারে মিল্লাত কথাটির সার্থকতাই ত এখানে। তিনি গর্জে উঠলেন :

'প্রাদেশিকতা হচ্ছে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনের জন্য মারাত্মক বিষ। আপনার আমার ধর্ম—ইসলাম। আর জাতি হিসেবে আমরা—পাকিস্তানী।'

মায়ের চোখ—মায়ের মন

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ যে ভাবে মোহাজিরদের জন্য দিন রাত অবিরাম পরিশ্রম করেছেন, তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা শুধু মায়ের চোখ থাকলে, মায়ের মন থাকলে, আর মায়ের মত বুক ভরা স্নেহ ভালোবাসা থাকলেই সম্ভব হতে পারে।

নেতৃত্বের পরীক্ষায় যেমন কায়েদে আজম গৌরব ও সাফল্য লাভ করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁরই হাতে নির্যাতিত মজলুম মুসলমানদের আজাদী দান করেছেন। ঠিক তেমনি পাকিস্তানের বাশিন্দাদের সত্যকার আজাদী যখন বিপন্ন হয়েছে তখন আর মাদারে মিল্লাত নির্বিকার থাকতে পারেন নি।

তাই ত তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ক্রুদ্ধ সিংহীনির মত আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজ সন্তানদেরকে বাঁচানর জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। আল্লাহ যাদেরকে চোখ দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি কিছুটা জ্ঞানও দান করেছেন, তারা বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখতে পাচ্ছে :

ঘনঘোর দুর্যোগ মুহূর্তে কায়েদে আজমের ছায়া-সংগিনী মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ সত্যকার মাদারে মিল্লাত হিসেবেই নিজ দায়িত্ব পালনে বরাবর এগিয়ে এসেছেন।

মাদারে মিল্লাতের কাশ্মীর সফর

কায়েদে আজমের ইন্তেকালের পরে পাকিস্তানের জনগণ যে ভাবে হতাশা ও শোক বেদনায় কাতর হয়ে পড়ল, তাই দেখে মাদারে মিল্লাত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি এসে দাড়ালেন শোকার্ত দেশবাসীর পাশে। দেশবাসীকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। সাহস দিলেন। কিন্তু ক্রমাগত বহু দিন ধরে সফর করতে করতে তিনি খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি ঠিক করলেন ঃ

এবারে কিছু দিন পারচুনারে বিশ্রাম নিবেন।

এক দিন পয়চারী করতে করতে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। সামনেই ছোট্ট একটি নদী আর সেই নদীর দুই তীরে মেষ ও ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল। হাওয়ার ভর করে সুন্দর বাঁশীর সুর ভেসে আসছিল।

কিছু দূরেই একটি গাছের তলায় বসে কিশোর রাখাল আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল। মাদারে মিল্লাতকে দেখে রাখাল তার বাঁশী হাত থেকে নীচে ফেলে দিল। সে ছুটে এল মাদারে মিল্লাতের কাছে। কিন্তু খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে মাদারে মিল্লাতকে দেখতে লাগল। তার কেমন যেন একটু লজ্জা পাচ্ছিল! তাই দেখে মাদারে মিল্লাত তাকে কাছে ডেকে, মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন।

তার কাছে টুকটাক অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। রাখাল ছেলেটির ভয় ভীতি দূর হল।

তার আনন্দ কে দেখে!
গর্বে তার বুক ফুলে উঠল।

কাশ্মীর রনাঙ্গনে মাদারে মিল্লাত (১৯৪৮)

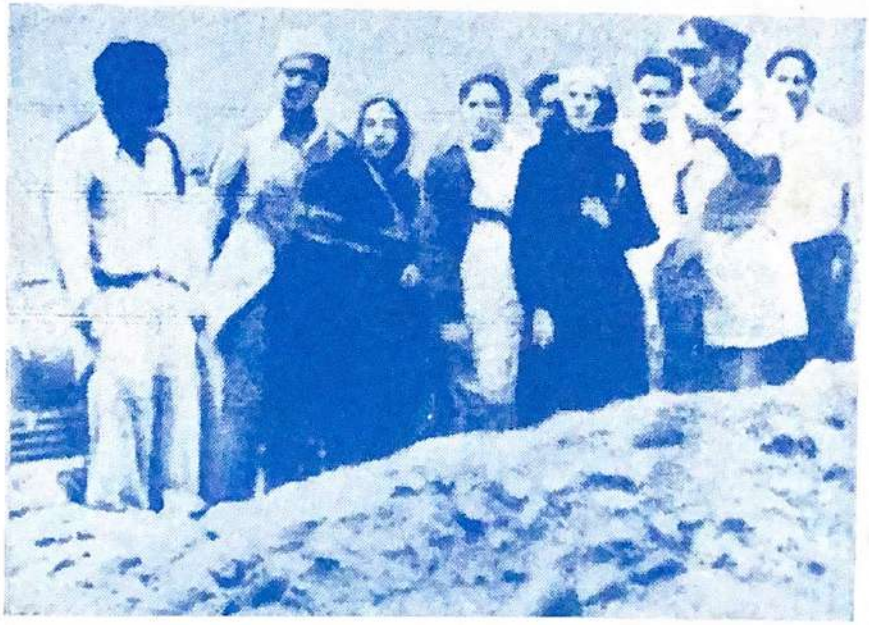

জনৈক মুজাহিদ অফিসার সামরিক তৎপরতার বিবরণ পেশ করছেন ।

: মাদারে মিল্লাত :

‘কাশ্মীরের বীর মুজাহিদ সন্তান তোমরা শোন! তোমাদের তাকবীর ধ্বনি অন্তর কাঁপিয়ে তুলছে, তোমাদের ঈমানের শক্তি সারা দুনিয়াকে বিস্মিত করেছে। তোমাদের ঈমানের দুর্জয় শক্তির দোহাই! সংকল্প সাহস তোমরা ক্রমেই বাড়িয়ে যাবে। নিজেদের বাহুবলে তোমরা ন্যায্য অধিকার হাসিল কর। কাশ্মীর জিন্দাবাদ, কাশ্মীর হামারা হায়।’

মাদারে মিল্লাত—আজকে যিনি যুদ্ধের ময়দানে এসে মুজাহিদগণকে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন—তিনি আগে থেকেই যুদ্ধের ময়দান হতে পেছনে বসে মুক্তিকামী কাশ্মীরী মুজাহিদগণের সম্ভাব্য সকল উপায়ে সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা দান করে আসছিলেন।

কায়েদে আজমের জিন্দেগীতে তিনি যে সব দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছিলেন. যে সব বিষয়ে তিনি দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন, কায়েদে আজমের ইন্তেকালের পরে তাতে কাশ্মীর সমস্যা যোগ হল।

ভাইয়ের মৃত্যুশোক যদিও তাজা ছিল, বেদনায় মন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজ দায়িত্বের কথা একটি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি।

১৯৪৮ সালের ৫ই নবেম্বর জাতির উদ্দেশে আবেদন করলেন:

‘কাশ্মীরে শীতের প্রকোপ খুব বেড়ে গেছে। মুজাহিদগণের কাছে দরকার মত গরম জামা-কাপড় নেই। অন্তত ১ লক্ষ ২০ হাজার কম্বল অবিলম্বে জোগাড় করতে হবে। নইলে প্রবল শীতে ইসলামের এই ‘জানবাজ’ মুজাহিদগণের অধিকাংশই হয়ত মারা পড়বে। শীতের দরুণ তাদের হাত পা অবস হয়ে পড়ছে। তাদের অবস হাত দিয়ে রাইফেল ও মেশিনগান ব্যবহার করা

সম্ভব হয়ে উঠছে না। ইস্পাত-কঠিন হৃদয়ের অধিকারী এই সব মুজাহিদ উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত দুশমন সেনাদলকে অবশ্যই পরাভূত করতে সক্ষম। কিন্তু প্রবল শীতের সামনে তারা অসহায়। আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে অনেক দূরে রয়েছি। কিন্তু আজাদী ও মুক্তি সেনাদের সাহায্যের জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়েআসতেহবে। দুর্জয় শীতের মোকাবিলায় তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে।'

এর পরে দেখা গেল : তিনি যেখানেই যাচ্ছেন কাশ্মীর-জিহাদে অংশ নিতে সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছেন। সমগ্র জাতি তাঁর আবেদনে সাড়া দিল। অল্প দিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কম্বল, গরম জামা কাপড় মুজাহিদগণের কাছে পৌঁছান হল।

১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত একযুব সম্মেলনে মাদারে মিল্লাত বক্তৃতা প্রসংগে বল্লেন :

'কাশ্মীরী মুজাহিদগণের সাহায্যের জন্য আমি যে আবেদন করেছিলাম, তাতে গোটা জাতি যে ভাবে সাড়া দিয়েছে, সে জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

এর পরেই মাদারে মিল্লাত অত্যন্ত দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

'আপনারা এ কথা মোটেই ভুলবেন না যে কাশ্মীরের আজাদী আর পাকিস্তানের আজাদী একই কথা।'

মাদারে মিল্লাতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গোবর্ধন দাস মার্কেটের ব্যবসায়ীগণ ১৯৪৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর কাশ্মীর ফাণ্ডে নগদ ২লক্ষ টাকা দান করেন।

এই উপলক্ষে মাদারে মিল্লাত কাশ্মীর সমস্যার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বল্লেন :

'পাকিস্তানের স্থায়িত্ব নিভর করছে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের উপরেই। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পরেই পাকিস্তান নিজের সকল সম্পদ কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। এক্ষণে কাশ্মীরের অবস্থা খুবই গুরুতর। লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরী নিজেদের বাস্তু ভিটা ছেড়ে পাকিস্তানে আসতে বাধ্য হচ্ছে। তাদেরকে সব রকমের সাহায্য করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।'

তিনি আরও বল্লেন :

'এভাবে অবশ্য সাময়িক অসুবিধা দূর হবে। কিন্তু মূল সমস্যার কোন সমাধান ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না কাশ্মীরী মুজাহিদগণ চূড়ান্ত জয়লাভ করেন।'

১৯৪৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর জুদিয়াবাজারের (করাচী) ব্যবসায়ীগণ ৪ লক্ষ টাকা কাশ্মীর তহবিলে দান করেন। সেই উপলক্ষে মাদারে মিল্লাত কাশ্মীরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বল্লেন :

'প্রতিরক্ষার দিক থেকে কাশ্মীর পাকিস্তানের জন্য প্রাণ স্বরূপ। পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় দরিয়াগুলো কাশ্মীর এলাকা অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করছে। খোদা না করুন, আমরা যদি কাশ্মীর হাসিল করতে না-ই পারি, তা হলে আমরা প্রকৃতির সব চাইতে বড় নেয়ামত পানি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ব।'

তারপরে তিনি দেশের তরুণ যুবকদেরকে উৎসাহিত করে বল্লেন :

'তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে : দলে দলে সেনাবাহিনীতে অবিলম্বে যোগদান করা। আমাদের শক্তি সামর্থ্যই আমাদের নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান উপায়।'

জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের ফলে কাশ্মীর যুদ্ধ থেমে গেল। এই সময়ে মাদারে মিল্লাত লাহোরে অনুষ্ঠিত ইকবাল দিবসের জনসভায় সভা-নেত্রীর অভিভাষণে ঘোষণা করলেন :

'আজকে সারা বিশ্বের দৃষ্টি কাশ্মীরের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে। যুদ্ধ থেমে গেছে অবশ্য কিন্তু আপোষ রফার শর্তাবলী এখনও চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করা হয় নি! এখনও তা আলোচনাধীন রয়েছে।'

কাশ্মীর সমস্যার সঠিক সমাধান সম্পর্কে মাদারে মিল্লাত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন :

'অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। যেন কাশ্মীরের জনগণ কোনও প্রকার চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।'

এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন :

'কাশ্মীর বিভাগ সম্পর্কে যে সব অবান্তর প্রস্তাব তোলা হচ্ছে, তা পাকিস্তান এবং কাশ্মীর বাসী উভয়ের জন্যই—গ্রহণ যোগ্য নয় মোটেই।'

কাশ্মীর সমস্যা যখন আলাপ আলোচনার আবর্তে পড়ে ঘরপাক খেতে লাগল, সে সময়ে কায়েদে আজমের দ্বিতীয় স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মাদারে মিল্লাত জাতির কাছে আহ্বান জানালেন। তাতে তিনি ভারতের অশুভ সংকল্প সম্পর্কে আলোকপাত করলেন :

'বিরুদ্ধ পক্ষ বিতর্ক সৃষ্টি করে কাশ্মীরীদের জন্মগত অধিকার নস্যাৎ করে দিতে চায়। কিন্তু আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে মজবুত মনোবলের অধিকারী পাকিস্তানী জনগণ এই প্রকাশ্য অবিচার কিছুতেই বরদাশত করবে না।'

আজাদীর পঞ্চম বছর শুরু হল এভাবে ঃ ভারত সরকার কাশ্মীরে জবর দখল কায়েম রাখার মতলবে পাকিস্তানের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত করে তুলতে বদ্ধ পরিকর হল। তখন মাদারে মিল্লাত সরেষে গর্জে উঠলেন ঃ

> 'আকাশে বিপদের ঘন ঘটা দেখা যাচ্ছে। কাশ্মীর দখলের সংকল্প ঘোষণা করা হচ্ছে। আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য উস্কানী দেয়া হচ্ছে। এসময়ে আপনাদের সবারই কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এবং কাশ্মীরের জনগণকে তাদের জন্মগত অধিকার আজাদী অর্জনের সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য দানে তৎপর হওয়া। আপনারা যদি সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করে সঠিকভাবে কাজ করতে থাকেন, তা হলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস-নিজেদের পথ আপনারা অবশ্যই বাধা-মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।'

আজও কাশ্মীর সমস্যা ভারতীয় কুট-তর্ক এবং সামরিক অনাচারের কবলে পড়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অচল অবস্থার সম্মুখীন রয়েছে। দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা একথাই বলছে যে ভারতীয় নেতারা যুক্তি ও ন্যায় নীতির পরোয়া করে না মোটেই। তা ছাড়া পাকিস্তানের গণশক্তির সুষ্ঠু বিকাশের পথে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হতে থাকায় কাশ্মীরীদের আজাদী লাভ এতখানি বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু আজও কাশ্মীর উপত্যকার গগনচুম্বী পাহাড় চুড়ায় মাদারে মিল্লাতের এই গর্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঃ

> 'আমার পরম সুখ-স্বপ্ন সেই দিন সফল হবে যে দিন আমার কাশ্মীরী মুজাহিদ বীর সন্তানকে মুবারকবাদ জানাতে শ্রীনগরে হাজির হতে পারব। সেই দিনের অপেক্ষায় আমি পথ পানে চেয়ে রয়েছি।'

সত্যিই ত কালের গতি মাদারে মিল্লাতের জন্য অপেক্ষা করছে।

তিনি আসবেন।

তিনি এসে কাশ্মীর ও পাকিস্তানের জনগণকে বৃথা আলাপ আলোচনার গোলক ধাঁধাঁ থেকে রেহাই দিবেন। আর নিজেদের বাহুবলে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের জনগণ মাদারে মিল্লাতের শ্রীনগর গমনের পথ পরিষ্কার করে তুলবে।

আর রাখাল ছেলের সেই বাঁশীর সুর—মাদারে মিল্লাত যা পারাচুনারের মাঠে দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন, সেই বাঁশী কাশ্মীর, জম্মু ও পাকিস্তানের কোটি কোটি জনতাকে এক সুরে, এক তালে জিন্দেগীর পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।

সেই সোনালী দিন আর কত দূরে ?

এই প্রশ্নের জওয়াব পেতে আজ জনগণমন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের আকাশ বাতাস ও কোটি কোটি মানুষের চোখে মুখে চেহারায় আজকে এই জিজ্ঞাসাই ত পরিস্ফুট।

কত মায়াময় তাঁর মন!

পশ্চিম পাকিস্তানের জনৈক প্রবীন সাংবাদিক লিখছেন ঃ

জীবন ও মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান কত সামান্য তা আমি পষ্ট অনুভব করতে পেরেছি মাত্র সে দিন।

আমি লায়ালপুর গামী বাসে চড়ে রওয়ানা হলাম।

সামনের সিটে কয়েকজন বরযাত্রী আর পেছনের সিটে কয়েকটি ছাত্রী বসেছিল। কলেজ বন্ধ হওয়ায় তারা নিজেদের বাড়ীতে ফিরছিল।

বাস স্টার্ট দিল।

কিছুক্ষণ পরেই আমার পাশে যে লোকটি বসেছিল—সে আমাকে বল্ল ঃ

'ওরা বরযাত্রী নয়। আসলে ওরা দুলা-দুলহিনকে দাতা সাহেবের দরগায় সালাম করাতে নিয়ে এসেছিল। এখন তারা বাড়ী ফিরছে।

হঠাৎ এক ধাক্কায় সব উলট পালট হয়ে গেল। 'হায় মর গেয়া', 'আল্লাহ ফজল' এ সব চিৎকারের মধ্যে বিরাট একটা শব্দ শোনা গেল। সেই সংগে আমিও সম্বিত হারিয়ে ফেল্লাম।

যখন আমার হুঁশ ফিরল ঃ তখন দেখতে পেলাম, আমি একটি গাছের তলায় ভাংগা চুরা একখানা খাটিয়ায় শুয়ে কাতরাচ্ছি।

আর আমার শিয়রের কাছে বসে একটি মেয়ে বলছে ঃ

'না, তোমার কোনও ভয় নেই। তেমন বেশী আঘাত লাগেনি। ওঠ এই নাও, একটু পানি খাও।'

আমি উঠতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু উঠতে আমি পারলাম না।

শুয়ে শুয়ে আমি মুখ খুলে ধরলাম। মুখ ও গলা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে গেল। আমিও অনেকটা সতেজ হলাম। এক মুহর্তের মধ্যেই সব কথা আমার মনে পড়ল। আমার মনে হল, যেন আমি সত্যই বেঁচে রয়েছি! আমি মরিনি। আমি মনে মনে খোদার শোকর আদায় করলাম। দু তিন ঢোঁক পানি খাওয়ার পরে আমি অনেকটা সামলে উঠলাম।

আশে পাশে যত গাছ ছিল—সে সবের তলায় আমার মতই আরও অনেকে পড়ে রয়েছে। আর ছাত্রীরা তাদেরকে ফাষ্টএড দিচ্ছে। রাস্তার উপরে লোকজনের ভীড় জমে গেল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি ছাত্রী লোক জনকে আহতদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এম্বুলেন্স গাড়ী এসে পড়ল। সেই ছাত্রীরাই আহতদেরকে গাড়ীতে তোলার কাজে সাহায্য করল। আমিও কোনও মতে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

আমাদেরকে শেখুপুরা সিভিল হাসপাতালে পৌঁছান হল।

হাসপাতালের স্টাফ বেশ তৎপরতার সাথেই আহতদের সবাইকে পরীক্ষা করল। আমি দেখতে পেলাম : সেখানকার ডাক্তার আহতদেরকে পরীক্ষা করে নিয়ে বেশ আরামসে সিগরেট ফুঁকছেন! আমার আর সহ্য হল না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম :

'ডাক্তার সাহেব ভালো আছেন ত?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'জ্বী, জনাব! একেবারে ষোল আনাই ভালো আছি।'

—এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বল্লেন :

'ছাত্রীদের চেষ্টা যত্নে আপনারা সবাই বেঁচে গেলেন বলতে হবে। একটু পরেই আশা করি আপনাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হবে। আর যে যার বাড়ীতে পৌঁছে যাবেন।'

এই ছাত্রীরাই ত পিছনের সিটে বসে ছিল। শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নুয়ে এল।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম :
'আপনারা কোন কলেজে পড়েন?'

'আমরা ফাতেমা জিন্নাহ মেডিকাল কলেজের ছাত্রী।'

এ যাবত আমার কাছে এই ফাতেমা জিন্নাহ মেডিকাল কলেজ আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মতই মামুলী ব্যাপার মনে হত।

কিন্তু আজকে সাক্ষাত মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই লাভের পরে আমার কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ অসাধারণ বিশেষ সংস্থা বলে মনে হতে লাগল।

কিং এডওয়ার্ড মেডিকাল কলেজ, মেও হাসপাতাল, লেডি উইলিংডন হাসপাতাল, জানকী দেবী হাসপাতাল—সত্য করে বলছি এ ধরণের নাম শুনে শুনে আমার মন যেন বিষিয়ে উঠত। এত সব বিদেশী বিজাতীয় নামের মধ্যে মাত্র এই একটি নামই ত আমাদের একান্ত আপন ছিল। আর তাই যা আমার ভরসার পাত্র ছিল।

কিন্তু এমন ধরণের প্রতিষ্ঠান ত প্রায়ই গড়ে উঠছে, যে সবের নামকরণ শুধু খোশামদ, কিংবা সন্তোষ লাভের জন্যই কোনও বড় লোকের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়। এই রেওয়াজটা আজকাল এত বেশী চালু হয়ে গেছে যে সত্যকার যথার্থ নামকরণ হলেও—তার কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।

আমার মনে হয়ঃ সারা পাকিস্তানে বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ফাতেমা জিন্নাহ মেডিকাল কলেজ। এই কলেজটি মাদারে মিল্লাতের নামের সাথে সংশ্লিষ্ট এ জন্য নয় যে তিনি কায়েদে আজমের বোন। বরং বিপন্ন মানবতার এই ত্রানকেন্দ্র আসলে মাদারে মিল্লাতেরই আশা আকাঙ্খা ও চেষ্টা তৎপরতার বাস্তব প্রতীক।

পাকিস্তান যেরূপ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কায়েম হয়েছিল সে কথা তিনিই ভালো করে জানতেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বলতে গেলে মুসলমানদের কোনও নাম নিশানাই ছিল না পাক-ভারত উপমহাদেশে।

জাতীয় পর্যায়ে এই শূন্যতা যে কত ভয়াবহ ছিল, এর পরিণাম যে কত মারাত্মক দাঁড়াতে পারে—সে কথা মাদারে মিল্লাত বেশ

ভালো করেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আপনারা মাদারে মিল্লাতের কাছেই শুনুন :

'১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে আমি যখন লাহোরে এলাম, তখন আমি অবস্থা পর্যালোচনার পরে উপলব্ধি করতে পারলাম যে লেডি ডাক্তারদের সংখ্যা খুবই কম। অবিলম্বে এ জন্য ট্রেনিং-য়ের ব্যবস্থা করা দরকার।

আমি তখন পাঞ্জাবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিঃ কারামত আলী এবং কর্নেল মালিক (ইন্সপেক্টর জেনারেল সিভিল হাসপাতাল) এদের সাথে মেয়েদের জন্য একটি মেডিকাল কলেজ স্থাপনের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম।

প্রস্তাব আসল--বালাকরাম মেডিকাল কলেজ এবং উক্ত কলেজ সংলগ্ন যে সব বাড়ীতে মোহাজেরগণ বাস করছে তাদেরকে অন্য জায়গায় বন্দোবস্ত করে দিয়ে ওখানটাতেই একটি মহিলা মেডিকাল কলেজ কায়েম করা হোক।

এভাবেই আমাদের ইতিহাসের তথা মুসলিম জাহানের মধ্যে সব প্রথম মহিলা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হল।'

মাদারে মিল্লাত নিজেও ত একজন চিকিৎসক। এই জন্যই স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তৎপরতা একান্ত স্বাভাবিক। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার মাত্র করেক মাস পরেই যখন লাহোরে অনুষ্ঠিত যক্ষ্মা নিরোধী সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন, তখন তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, বলতে গেলে সেই ভাষণই হচ্ছে পাকিস্তানে যক্ষ্মা বিরোধী আন্দোলনের মেনিফেস্টো। তিনি ঘোষণা করলেন :

'যক্ষ্মা রোগকে আমাদের জাতীয় দুশমনদের মধ্যে পয়লা নম্বরের বলে ভাবতে হবে। আর তেমন মনোভাব নিয়েই সর্বাত্মক

অভিযান চালাতে হবে—এই সর্বনাশা ব্যাধিকে নিমূল করার জন্যে।'

প্রসঙ্গক্রমে তিনি রোগী ও চিকিৎসক এবং সরকার ও চিকিৎসকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার উপরে বিশেষ জোর দিয়ে দেশের চিকিৎসকদের কাছে আবেদন জানালেন :

'আপনাদের সামনে এমন পাকিস্তানের আদর্শ থাকা দরকার যেখানে
যক্ষ্মার মত মারাত্মক ব্যাধির নাম নিশানা নেই।
এমন পাকিস্তান যেখানে সুস্থ সবল ও সুখী মানুষ বসবাস করছে।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

মহিলা চিকিৎসক ও নার্সদের গুরুত্ব সম্পর্কে মাদারে মিল্লাতের ঘোষণা

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মাদারে মিল্লাত যখন ঢাকায় আগমন করেন, তখন ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের তরফ থেকে তাঁকে বিশেষ ভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। উক্ত সমাবেশে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের মা-বোনদের উপরে যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, সে কথা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে বল্লেন : 'দেশের সব চাইতে বেশী প্রয়োজন রয়েছে এখন লেডি ডাক্তার, নার্স এবং শিক্ষিকাদের।'

তারপরে তিনি ২৮শে মার্চ তারিখে (১৯৪৮) ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে এ বিষয়ে আবার তাকিদ দিয়ে ঘোষণা করলেন : 'পাকিস্তানের এক্ষণে বিপুল সংখ্যক সমাজকর্মী, মহিলা-চিকিৎসক, ও নার্সদের প্রয়োজন অনেক বেশী রয়েছে।'

সেই বছরই তিনি একবার কোয়েটা সফরে যান। কোয়েটা রেসিডেন্সীতে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এক বিরাট সমাবেশে মাদারে মিল্লাত আহ্বান জানালেন : 'আপনারা অনেক ভাল কাজই করতে পারেন। যেমন এতীমখানা, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, প্রসূতি সদন ও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তুলতে পারেন। একটু মনোযোগ দিতে পারলে এসব কাজ অনায়াসে করতে পারেন আপনারা।'

সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে করাচীর কায়েদাবাদে স্থাপিত একটি নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করতে গিয়ে মাদারে মিল্লাত সমাজকল্যাণে অগ্রণী ডাক্তারদের খুবই প্রশংসা করেন। এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি উপদেশ দান করেন।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীর 'ফাতেমা জিন্নাহ মেটারনিটি এণ্ড নার্সিং হোম' উদ্বোধন করতে গিয়ে মাদারে মিল্লাত জাতীয় স্বাস্থ্য-সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেন। এবং তরুণী-দেরকে নার্সিং বৃত্তি গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নার্সিং বৃত্তির মহত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন :

'এটি একটি অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত পেশা। এই সম্মান অর্জনে সাফল্য লাভের অর্থ—আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও জনসেবার আগ্রহ উৎসাহ মওজুদ রয়েছে। এই সেবা বৃত্তিটি মানবতার পূর্ণতা বিধান করে। তাছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের ধর্ম—ইসলাম অনেক বেশী জোর দিয়েছে।

মোটকথা পাকিস্তানে এই মহৎ বৃত্তি সম্পর্কে কোনও প্রকার সংকীর্ণতা থাকলে চলবে না।'

১৯৪৯ সালের ১৫ই আগষ্ট ডাউ মেডিকাল কলেজে কায়েদে আজমের তৈল-চিত্র উন্মোচন করতে গিয়ে মাদারে মিল্লাত বলেন :

'আপনাদের পেশাটি অত্যন্ত মহৎ। এর একমাত্র উদ্দেশ্য দুঃস্থ মানবতার সেবা সাহায্য। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আপনাদের স্বদেশবাসী ভাই-বোনদের দুঃখ দুর্দশা মোচন করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।'

সেই বৎসরই বিশ্ব-স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে শিশু প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে মাদারে মিল্লাত পাকিস্তানী মায়েদেরকে শিশুদের কল্যাণ প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান-সম্মত পন্থা অবলম্বনের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করেন। এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে তিনি দু হাত তুলে মোনাজাত করে বলেন :

'আল্লাহ আপনাদের আশা সফল করুন। আর শিশুদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিধানে পাকিস্তানী জনগণের উপরে যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, তা সঠিকভাবে পালন করার সামর্থ্য দান করুন।'

জাতীয় জীবনে মহিলাদের ভূমিকা

জাতীয় জীবনে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণে তৎপরতা অবলম্বনের জন্য মহিলা সমাজকে উৎসাহ দানের কোনও সুযোগ তিনি ব্যর্থ হতে দেন নি। ১৯৫০ সালের ১৫ই জানুয়ারী হায়দরাবাদ লেডিজ ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক মহিলা সমাবেশে মাদারে মিল্লাত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন :

'সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে এই যে আপনারা নিজেদের সন্তানদের মন-মস্তিষ্ক থেকে গোলামী আমলের সব রকমের প্রভাব সমূলে দূর করে দিন।

এ কাজটি যত তাড়াতাড়ি করতে পারবেন, ততই দেশ ও জাতির মংগল হবে। আমাদের এখন দরকার—লেডী ডাক্তার আর কর্মতৎপর নার্সদের। কিন্তু আমাদের মহিলা সমাজ সেদিকে বলতে গেলে মোটেই লক্ষ্য করেন নি।

অথচ এটি শুধু সম্মানিত পেশাই নয়, বরং এভাবে ঘরের চার দেয়ালের মধ্য হতে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত তাঁরা কওম ও মানবতার সেবা করতে পারেন।'

পাকিস্তানী যুব সম্প্রদায়কে চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জনে উৎসাহদানের সুফল আমরা তখনই লাভ করতে সক্ষম হব, যখন আমরা তাদের নিয়মিত পড়াশোনার সুবন্দোবস্ত করতে পারব। মাদারে মিল্লাত সে দিকেও নজর রেখেছেন।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে তিনি এক বিবৃতিতে দেশবাসী ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন পাকিস্তানে সর্বপ্রথম 'দন্ত স্বাস্থ্য সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছিল। উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেছেন:

'বড়ই আফসোসের কথা এই যে পাকিস্তানে একটি মাত্র ডেণ্টাল কলেজ রয়েছে। তাও আবার সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক অবস্থায়। দেশের প্রয়োজন মেটাতে হলে অবিলম্বে আরও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করতে হবে। ডেন্টাল হাসপাতাল কায়েম করতে হবে।

এরই কয়েক দিন পরে মাদারে মিল্লাত মেয়েদেরকে ডেন্টাল সার্জারী শিখতে উৎসাহ দান প্রসংগে বলেন:

'আমাদের মেয়েরা যদি ডেন্টাল সার্জারী শিখতে পারে, তবে আমাদের বোন ও শিশুরা অনেক রোগ ব্যাধি ও কষ্ট ক্লেশের হাত থেকে রেহাই পেতে সক্ষম হবে।'

১৯৫০ সালের ১৭ই মার্চ লাহোরে ফাতেমা জিন্নাহ মেডিকাল কলেজের প্রথম বার্ষিক পরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাদারে মিল্লাত

পাকিস্তানের মহিলা সমাজকে চিকিৎসা-বিদ্যা ও নার্সিং শেখার কাজে বিশেষভাবে তৎপর হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন :

'পাকিস্তানে ডাক্তার ও নার্সদের সংখ্যা এতই কম যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করতে পারলে চলবে না। যে সব কারণ আমাদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে, আসলে সে সব দূর করাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

ছাত্রীদেরকে তিনি লক্ষ্য করে বলেন :

'দেশ ও জাতি তোমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে,অনেক আশা নিয়ে। তোমারই ত উজ্জ্বল গৌরবময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।'

দায়িত্বহীন সরকার ও বিত্তবানদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী

অল্প দিনের মধ্যেই মাদারে মিল্লাত যখন দেখতে পেলেন—সরকার ও বিত্তবান শ্রেণী নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে গাফলতি করছে। তখন আর তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাই মাদারে মিল্লাত গর্জে উঠলেন :

'তিন তিনটি কঠিন বছর কেটে গেল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মাত্র একটি কিংবা দুটো নয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর আগে থেকে যে সব প্রতিষ্ঠান কায়েম ছিল, সে সবের অবস্থাও যে অত্যন্ত শোচনীয়। মানবতার দিক থেকে অতি প্রয়োজনীয় এ সব কাজ বলতে গেলেই কিছুই করা হয় নি।'

মাদারে মিল্লাত এই গাফলতির জন্য সরকারী কর্মচারীদেরকে সতর্ক করে বল্লেন :

> 'জাতীয়-স্বাস্থ্যের মান ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এমন দেশ—যেখানের বাশিন্দাদের স্বাস্থ্য দুর্বল, যারা নিস্প্রাণ—তারা কোনও দিন উন্নতি করতে পারে না।'

কিন্তু দেখা গেছে মাদারে মিল্লাতের এসব কাজকেই অনেকেই নিজ গুণ ও জ্ঞানের বহর মোতাবেক চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়ে সমালোচনার উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। কি আশ্চর্য!

শুধু শহর নয়, গ্রামবাসীদের কথাও স্মরণ রেখেছেন

নামকা ওয়াস্তে হলেও শহরে যৎকিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত দেখা যায়।

কিন্তু দেশের বেশীর ভাগ লোক যে গ্রামেই বসবাস করে।

অথচ সেখানের লোকজন কোনও রকম সুযোগ সুবিধা পায় না, এ কথা অনায়াসে বলা যায়।

ক্ষমতা লোভী কুচক্রী দল ত আসলে জ্ঞানান্ধ বে-ঈমান। তাই ওরা নিজেরা কিছুই দেখতে পায় না। আর কেউ যদি কিছু বলে, তবে তাতে কান দেয় না মোটেই—ওরা অন্ধ, ওরা বধির।

কিন্তু মাদারে মিল্লাতের কথাই যে আলাদা।

তিনি দেখলেন।

তাই পাকিস্তান মেডিকাল সমিতির বার্ষিক ভোজ-সভায় মাদারে মিল্লাত বল্লেন :

> 'গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় রোগব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। গরীব বেচারাগণ সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে। এ ছাড়া আর কিই বা করতে

'জাতীয়-স্বাস্থ্যের মান ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এমন দেশ—যেখানের বাশিন্দাদের স্বাস্থ্য দুর্বল, যারা নিষ্প্রাণ—তারা কোনও দিন উন্নতি করতে পারে না।'

কিন্তু দেখা গেছে মাদারে মিল্লাতের এসব কাজকেই অনেকেই নিজ গুণ ও জ্ঞানের বহর মোতাবেক চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়ে সমালোচনার উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। কি আশ্চর্য!

শুধু শহর নয়, গ্রামবাসীদের কথাও স্মরণ রেখেছেন

নামকা ওয়াস্তে হলেও শহরে যৎকিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত দেখা যায়।

কিন্তু দেশের বেশীর ভাগ লোক যে গ্রামেই বসবাস করে।

অথচ সেখানের লোকজন কোনও রকম সুযোগ সুবিধা পায় না, এ কথা অনায়াসে বলা যায়।

ক্ষমতা লোভী কুচক্রী দল ত আসলে জ্ঞানান্ধ বে-ঈমান। তাই ওরা নিজেরা কিছুই দেখতে পায় না। আর কেউ যদি কিছু বলে, তবে তাতে কান দেয় না মোটেই—ওরা অন্ধ, ওরা বধির।

কিন্তু মাদারে মিল্লাতের কথাই যে আলাদা।

তিনি দেখলেন।

তাই পাকিস্তান মেডিকাল সমিতির বার্ষিক ভোজ-সভায় মাদারে মিল্লাত বল্লেন:

'গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় রোগব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। গরীব বেচারাগণ সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে। এ ছাড়া আর কিই বা করতে

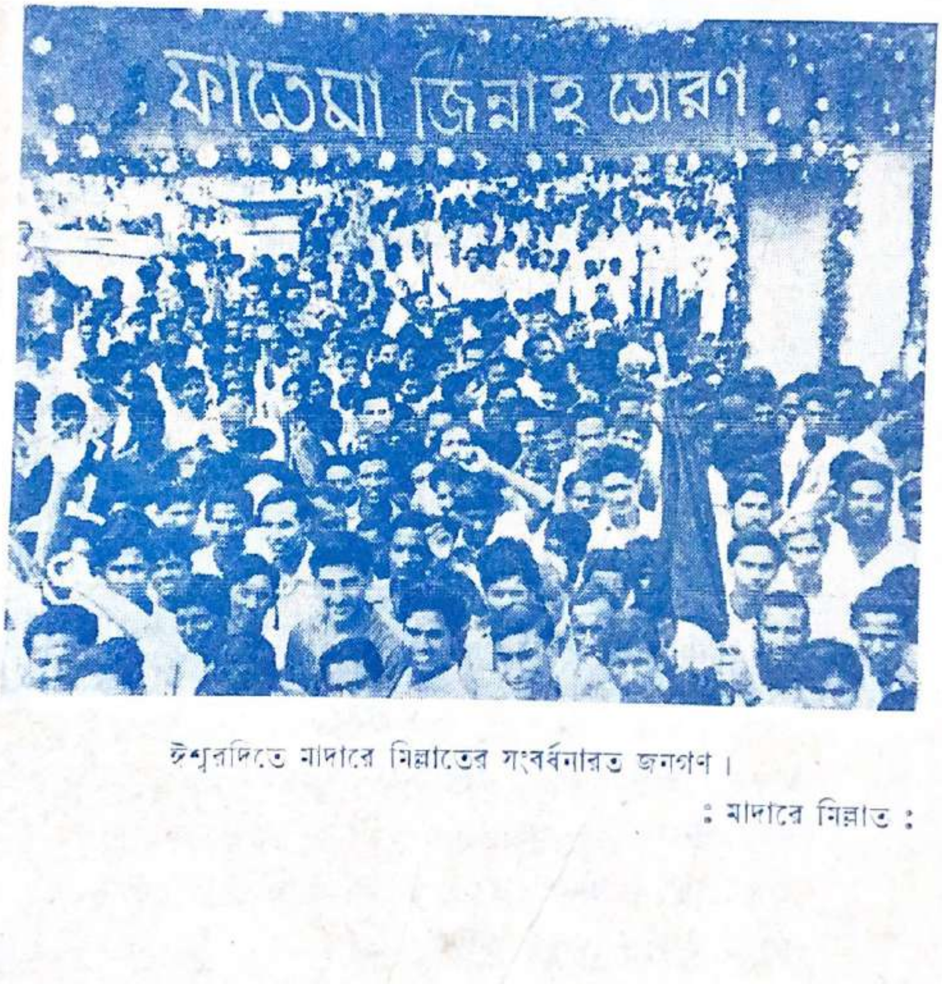
ফাতেমা জিন্নাহ তোরণ

ঈশ্বরদিতে মাদারে মিল্লাতের সংবর্ধনারত জনগণ।

পারে তারা। আপনাদের কাছে সকাতর আবেদন এই যে, সুশিক্ষিত ডাক্তারগণকে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করতে উৎসাহ দিন। আর তাদের মনে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধার তুলনায় সেবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে আপনারা সচেষ্ট হোন।'

মায়ের চোখে কেউ ছোট নয়

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ নিজে যদিও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি শাখা ডেণ্টাল-সার্জারীতে সুশিক্ষিতা।

কিন্তু তাঁর উদার মহান হৃদয় মনে দেশ ও জাতির সব কিছুই যে সমান আদরের। তাঁর কাছে কেউ ছোট নয়, কোনও কিছুই যে উপেক্ষার বস্তু নয়।

মাদারে মিল্লাতের দেশ-প্রেম, জাতির জন্য ভালোবাসা প্রেম নির্মল অকৃত্রিম।

তাতে কোনও গাঁদ নেই।

সব টুকুই যে খাঁটি সোনা।

তাই ত তাঁর কথা দেহ মনে শিহরন জাগায়। তাঁর কোনও কথাই যে ধার করা, পরের কাছ থেকে শেখা বুলি নয়।

তাই ত আমরা দেখতে পাচ্ছি:

দেশের সবাই সুস্থ হোক, সবল হোক, কর্মঠ হোক, বেকার বসে না থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াক, সবাই মান-ইজ্জতের অধিকারী হোক, জীবনে সবাই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক—এই ইচ্ছাই তাঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কাজে পরিস্ফুট হয়েছে। বার বার বহু বার নয় বরং প্রত্যেক বারই এই সত্যটি সবার কাছে ধরা দিয়েছে। এ কথা

কাউকে আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। তার ভালোবাসা আমাদের প্রতি এতই উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত।

আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি :

মাদারে মিল্লাত চান পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ যেভাবে হোক না কেন, সম্ভব হলে এই মুহূর্তেই রোগ-ব্যাধি, কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করুক। কোনও বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি অন্ধ সমর্থক তিনি নন। আবার কোনও বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু মাত্র বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন না।

এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি : একমাত্র কায়েদে আজম এবং মাদারে মিল্লাতই স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য-সমস্যা সমাধানের সঠিক পন্থা আবিষ্কারের নামে এযাবৎ যত বাহাদুরি করা হয়েছে, তার ফলে মূল সমস্যার যদিও কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু দেশের অর্থসম্পদ অকারণ বরবাদ হওয়া ছাড়া আর কিই বা হয়েছে ?

অথচ মাদারে মিল্লাত সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথা সময়ে যথাযথ ভাবেই কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আজ থেকে ১৫ বছর আগেই মাদারে মিল্লাত হোমিওপ্যাথির গুণ ক্ষমতা এবং সহজলভ্যতা সম্পর্কে স্বীকৃতি জানিয়ে হোমিও প্যাথদের কাছে দাবী করেছিলেন :

'আপনারা শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের মান উন্নত করুন। গবেষণার দিকে বিশেষ জোর দিন। তবেই আপনাদের বিরুদ্ধে যে সংকীর্ণতা এখন দেখা যাচ্ছে, তা দূর হবে।'

মাদারে মিল্লাত হোমিও চিকিৎসকদের কাছে আবেদন জানালেন :

'আপনারা দেশের অনেক খেদমত করতে পারেন। আপনারাই

> দেশের লক্ষ লক্ষ রোগার্তদের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করতে পারেন—যারা নিজেদের রোগ-ব্যাধির কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছে না।'

পশ্চিম পাকিস্তানের বাশিন্দাদের একটি বিরাট অংশ ইউনানী বা হাকিমী চিকিৎসায় অভ্যস্ত। মাদারে মিল্লাত অকুণ্ঠ মনে এই জাতীয় চিকিৎসার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা কামনা করছেন। ১৯৫০ সালে নিখিল পাকিস্তান তিব্বী কনফারেন্সের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার অংশ-বিশেষ এখানে পেশ করা হল।

মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করলেন :

> 'বিদেশী ইংরেজদের আমলে আমাদের এই জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ভাব পোষণ করা হত। তবুও দেখা যাচ্ছে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেই বিলুপ্ত হয় নি। বরং দেশের একাংশে এর জনপ্রিয়তা বরাবর অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই চিকিৎসা ব্যবস্থার কার্যকারিতার প্রমাণ হিসেবে এই একটি কথাই ত যথেষ্ট।'

ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির বিকাশে সরকারী সহায়তার প্রয়োজন উল্লেখ করে মাদারে মিল্লাত বলেন :

> 'পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে সবাই আশা পোষণ করতে পারে—একান্ত সংগত ভাবেই তা পারে—যে সকল শাস্ত্র আমাদের পূর্ব পুরুষগণের অতন্দ্র সাধনার ফলে এক দিন বিকাশ লাভ করেছিল, যে সবের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য বিদেশী শাসকদল আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছে,—আবার তা বিকাশ লাভ করুক।'

এই সংগে তিনি এনাটমী ও সার্জারীতে এলোপ্যাথির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করে বল্লেন :

আপনাদের উচিত—উদার মনোভাব নিয়ে এলোপ্যাথির মধ্যে

যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা পুরোপুরি আয়ত্বে আনার চেষ্টা করা। আপনারা গবেষণার প্রতি মনোযোগ দিন। আর ফলপ্রদ পরীক্ষিত নোস্‌খাসমূহ সযত্নে গোপন রাখার অভ্যাস ও মনোবৃত্তি বর্জন করুন।'

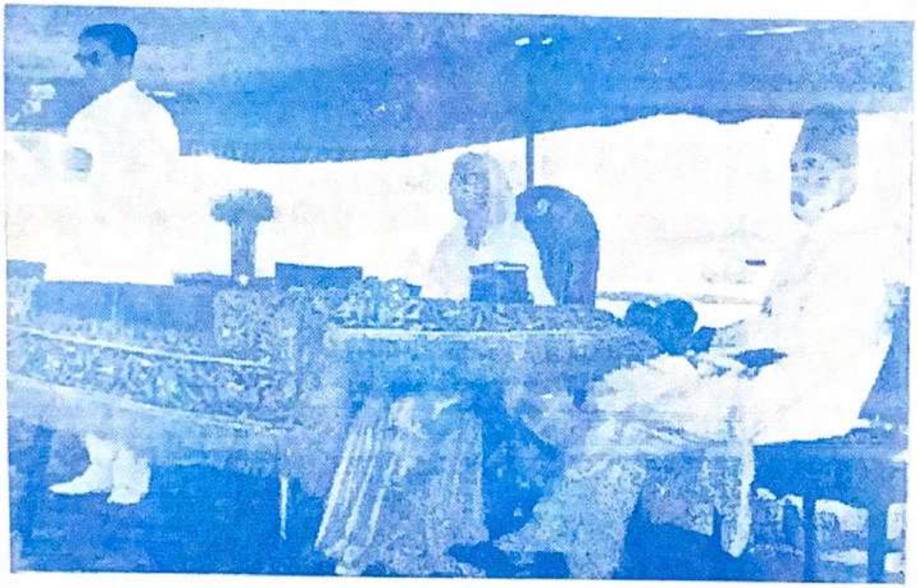

করাচীতে জামিয়া তিব্বিয়া শারকিয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাদারে মিল্লাতকে মান-পত্র পেশ করা হচ্ছে। মাইকের সামনে জনাব হাকীম মোহাম্মদ সায়ীদ, চেয়ারম্যান, হামদার্দ (ট্রাস্ট) এবং মাদারে মিল্লাতের বাম পাশে চেয়ারে জনাব হাকীম আবদুল হাকীজ (প্রিন্সিপাল, জামিয়া তিব্বিয়া শারকিয়া)।

: মাদারে মিল্লাত :

পাকিস্তানের বৃহত্তম তিব্বিয়া কলেজ উদ্বোধন

প্রসংগ ক্রমে উল্লেখ করা যায় যে পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট চিকিৎসক ও স্বনামখ্যাত জননায়ক হাকীম আজমল খানের স্থাপিত দিল্লী তিব্বিয়া কলেজের আদর্শে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে হামদর্দ ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত করাচীর জামিয়া তিব্বিয়া শারকিয়ার উদ্বোধন করেন—মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ।

এই ঘটনাটি ১৯৫৮ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখের।

মাদারে মিল্লাতের সমাজ কল্যাণমূলক কর্ম-তৎপরতার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এ যাবত পেয়েছি—তাতে এ কথা দিনের আলোর মতই সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে ঃ

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে তিনি যে বিরাট দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছিলেন, তাতে তিনি পরিপূর্ণরূপেই সফল হয়েছেন।

মাদারে মিল্লাত কথাটি মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার ব্যক্তিত্বে সফল হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

শুধু পাকিস্তান কেন—তিনি মুসলিম জাহানের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ গৌরবের অধিকারিণী। তাঁর সম্পর্কে যত ভাবা যায়, ততই যে বিস্ময়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। মনে হয় যেন সবই নূতন, সবই আমাদের অজানা কথা!

কিন্তু তিনি যে আমাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন—ঠিক মায়ের মতই।

সন্তানের কাছে মায়ের মনে যেমন কোনও দাবী থাকে না, অথচ সন্তানের দাবীতেই মা যেমন বেঁচে থাকে, ঠিক তেমনি মাদারে মিল্লাত আমাদের দাবীতেই যে বেঁচে রয়েছেন সে কথাই আজকে তিনি প্রমাণ করলেন এই বুড়ো বয়সে।

সন্তানের দাবীই যে মায়ের অস্তিত্ব! এ কথা যে কত সত্য— এখানে তাই দেখুন।

মাদারে মিল্লাত মিয়াঁনওয়ালীতে আয়োজিত জনসভায় যোগদানের জন্য আগমন করছেন। : মাদারে মিল্লাত :

নির্মম সেই দিনগুলো !

এবারের কাহিনী আমাদের শুরু হবে—সেই পঁয়ত্রিশটি দিন থেকে।

যে দিনগুলো জাতির জনক কায়েদে আজমকে অন্তত বিশ বছর বুড়ো বানিয়ে দিয়েছিল।

আর অশুভ প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর ইন্তেকাল ঘনিয়ে এল। তাতেও শেষ হল না। বরং এর পরেও সেই ঘটনার জের চলতে লাগল।

আমাদের এই কাহিনীর পটভূমিকায় রয়েছে—কাশ্মীর।

অবশ্য পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সাথে সাথেই এই দুর্বিসহ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল।

পুঞ্চের মুক্তিকামী মুসলমানগণ কাশ্মীরের হিন্দু ডোগরাশাহীর অকথ্য জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজাদীর ঝাণ্ডা উঁচু করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল।

হিন্দু ডোগরা শাহী পুঞ্চের বীর বাহাদুর মুজাহিদগণকে কাবু করতে না পেরে জম্মুর নিরস্ত্র মুসলিম জনসাধারণের উপরে ডোগরা সৈন্য বাহিনীকে লেলিয়ে দিল। আর তারা হিন্দু ডোগরা রাজের মর্জি মাফিক মুসলমানদেরকে পাইকারী ভাবে হত্যা করতে লাগল।

সে কী বীভৎস ব্যাপার!

পাকিস্তানের মুসলমানদের পক্ষে তখন নির্বিকার ভাবে বসে থাকা সম্ভব হল না। তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল।

কাশ্মীরের নির্যাতিত মজলুম মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাকিস্তানী নওজোয়ান মুজাহিদগণ এগিয়ে গেলেন—বিপন্ন

ভাইদের কাছে। আর সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখল :

> মুসলিম মুজাহিদগণ সত্যই খালি হাতেও যুদ্ধের ময়দানে প্রলয় ঘটাতে পারে।

হিন্দু ডোগরা মহারাজা পর পর শোচনীয় পরাজয় বরণের পরে ১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর হিন্দু-ভারতের সাথে সংযুক্তির প্রস্তাব নিয়ে সাহায্যের জন্য ভিক্ষা-পাত্র হাতে দিল্লীর দরবারে হাজির হল।

ভারত সরকার ত সুযোগের অপেক্ষাই করছিল। নেহেরু সরকার এই বাহানায় বিপুল সৈন্য, রণ সম্ভার কাশমীরে পাঠাতে লাগল।

ঠিক সেই দিনই কায়েদে আজম মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে সাথে নিয়ে করাচী থেকে লাহোর রওয়ানা হলেন।

কায়েদে আজমের তৎকালীন মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল ই. সেণ্ট.জে.বার্নী তার ব্যক্তিগত ডায়রীতে এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> 'রোববারে কায়েদে আজম ও মিস জিন্নাহ লাহোর রওয়ানা হলেন। তাঁর এই সফর কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্যই ছিল। যা নিয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।
>
> লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য লাহোরে আসবেন।'

কর্নেল বার্নী স্বীয় ডায়রীর অপর এক জায়গায় লিখেছেন :

> 'কায়েদে আজমের অবস্থা ছিল এই যে কোনও বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে না দেখবেন, ততক্ষণ সে বিষয়ে তিনি স্বীয় মতামত কিছুতেই প্রকাশ করবেন না।'

তাতে আরও দেখা যায় ঃ

> 'পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল হিসেবে এ বিষয়ে তাঁকে একটা চূড়ান্ত ফায়সালা অবশ্যই করতে হবে।'

অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছিল। তাই তিনি ছুটে এলেন—লাহোরে। কায়েদে আজম নির্দেশ দিলেন—পাকিস্তানের অসম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনীকে কাশ্‌মীর অভিযানের জন্য।

তৎকালীন পাক-ভারত যৌথ কমাণ্ডার স্যর ক্লড অকিনলেককে দু' ঘণ্টার নোটিশে লাহোরে তলব করলেন।

কায়েদে আজমের প্রস্তাব শুনে ইংরেজ কমাণ্ডার বল্ল ঃ

> 'যদি পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী এ সময়ে কাশ্‌মীরে কোনও রকম তৎপরতা দেখায়, তা হলে আমিও ইংরেজ মিলিটারী অফিসারদেরকে ফেরত ডেকে পাঠাব।'

এই অফিসারদের মধ্যে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান সেনাপতিও ছিলেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে কায়েদে আজমের প্রস্তাব বাতিল করতে হল।

কর্নেল বার্নী আরো লিখছেন ঃ

> 'এই ঘটনার প্রায় সংগে সংগেই কায়েদে আজম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবং বেশ কিছু দিন অসুস্থ অবস্থায় লাহোরেই কাটালেন।
>
> ১লা ডিসেম্বর তিনি লাহোর থেকে করাচী রওয়ানা হলেন। করাচী পৌঁছানর পরে আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখন আমার মনে হল ঃ মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আগে তিনি যে শরীর নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিলেন, সে তুলনায় তিনি অন্তত বিশ বছর বুড়ো হয়ে ফিরলেন।'

পাকিস্তানের ইতিহাসে চরম সংকট-জনক মুহূর্তে একজন বৃটীশ অফিসার আইনগত ওজর দেখিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়ায় বাঁধা দিয়েছিল। আর সেই আইনগত ওজরই আসলে কায়েদে আজমের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল।

শুধু তাই নয় সেই ঘটনার জের বহু দিন ধরে চলতে থাকল।

এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কি মাদারে মিল্লাত কখনও ভুলতে পারেন ?

তখনকার অবস্থা যে কত গুরুতর ছিল, তা এখন ভাবতে গেলে শরীর মন শিউরে ওঠে।

পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার, আজাদী রক্ষার তখন একমাত্র উপায় ছিল :

> সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় পাকিস্তানের নওজোয়ানদের প্রায় খালি হাতে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া।

মাদারে মিল্লাত এগিয়ে এলেন। তিনি মুসলিম নারীদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুল্লেন। বিভিন্ন জায়গায় ন্যাশনাল গার্ড কায়েম হল।

কোয়েটায় তিনি মহিলা ন্যাশনাল গার্ডদের প্যারেড পরিদর্শন করে অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি সেখানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, এখানে তার কিছু অংশ পেশ করছি :

> 'আমাদের জাতীয় ইতিহাস —মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীতে ভরপুর।'
>
> ফাতেমা বিন্‌তে আবদুল্লাহকে দেখুন :
>
> ত্রিপলীর যুদ্ধের ময়দানে আহত মুজাহিদগণকে পানি পান করাতে করাতে নিজের জান কোরবান করেছে।
>
> চাঁদ বিবির কথাই ধরুন !

> তিনি কত বীর বিক্রমের সাথে নিজ সেনা বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দানে পরিচালিত করেছেন।

আপনারা একথা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন :

> পাকিস্তানের আজাদী রক্ষার দায়িত্ব শুধু পুরুষদের উপরেই ন্যস্ত নয়। বরং প্রত্যেকটি নারীর জন্যও তা অবশ্য কর্তব্য।'

কায়েদে আজম যতদিন বেঁচে ছিলেন—তত দিন মাদারে মিল্লাতের কর্মতৎপরতা—দুস্থ মোহাজিরগণের পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর কায়েদে আজম নিজে তখন ব্যস্ত ছিলেন—শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, শিল্প, ব্যবসায় এবং দেশরক্ষা ইত্যাদি জরুরী বিষয় নিয়ে।

অবশেষে তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর গোটা কওমকে ঠিক মাঝ পথে রেখে দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন।

কিন্তু ক্রমাগত ৪৬ বছরের ছায়া-সংগিনী ও কঠোর বাস্তব ট্রেনিং প্রাপ্ত বোন মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ আপন ভাইয়ের অসমাপ্ত কাজ পুরা করার জন্যই ত আমাদের মধ্যে আজও বেঁচে রয়েছেন।

দেশ ও জাতির চরম দুর্যোগ মুহূর্তে তিনি নিজের শোক বেদনা সব কিছু চাপা দিয়ে ময়দানে নেমে এলেন। তিনি দেখলেন : দেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। ইংরেজ সামরিক অফিসারদের ফিরিয়ে নেয়ার কথা, সেই হুমকির কথা তাঁর মনে ছিল। তিনি এক মুহূর্তের জন্য সে কথা ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি দেশের যুবকদেরকে ডাক দিলেন :

> 'আমাদের এই দেশের তরুণ যুবকদের এক্ষণে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করতে হবে।

> এক্ষণে প্রিয় জন্মভূমির নিরাপত্তার দায়িত্ব পাকিস্তানের যুবকগণ নিজেদের কাঁধে তুলে নিক।'

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে লাহোরের জাতীয় স্বেচ্ছা বাহিনী মাদারে মিল্লাতকে একটি মানপত্র পেশ করল। তার জওয়াবে বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বল্লেন :

> 'ইসলাম আমাদেরকে 'হাতিয়ারবন্দ' অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আমরা নিজেদের সংকল্পের কথা ভুলে রঙ তামাশায় দিশাহারা হয়ে গেছি। যার ফলে মুসলমানদেরকে চরম শোচনীয় দুর্ভোগ দুর্দশা পোহাতে হয়েছে অনেকবারই।'

অবস্থার সন্তোষজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করে বল্লেন :

> 'এক্ষণে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে মুসলমানদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ পয়দা হয়েছে। এমন কি নারী সমাজও আজকে পূর্ণ সাহস ও শক্তি নিয়ে যে কোনও বিপদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
>
> আমি বলব : প্রত্যেকটি নারী—বিশেষ করে আমাদের সমাজের প্রতিটি শিক্ষিতা নারীর জন্য সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে।
>
> যাতে তারা নিজেদের বাড়ী ঘরের হেফাজত নিজেরাই করতে পারবে। আর পুরুষেরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধের ময়দানে বাহাদুরীর সাথে দুশমনদের দর্প চূর্ণ করতে সক্ষম হবে।'

জাতিকে উদ্দেশ করে মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করলেন :

> 'আমি চাই—পাকিস্তানের আজাদী ও নিরাপত্তা

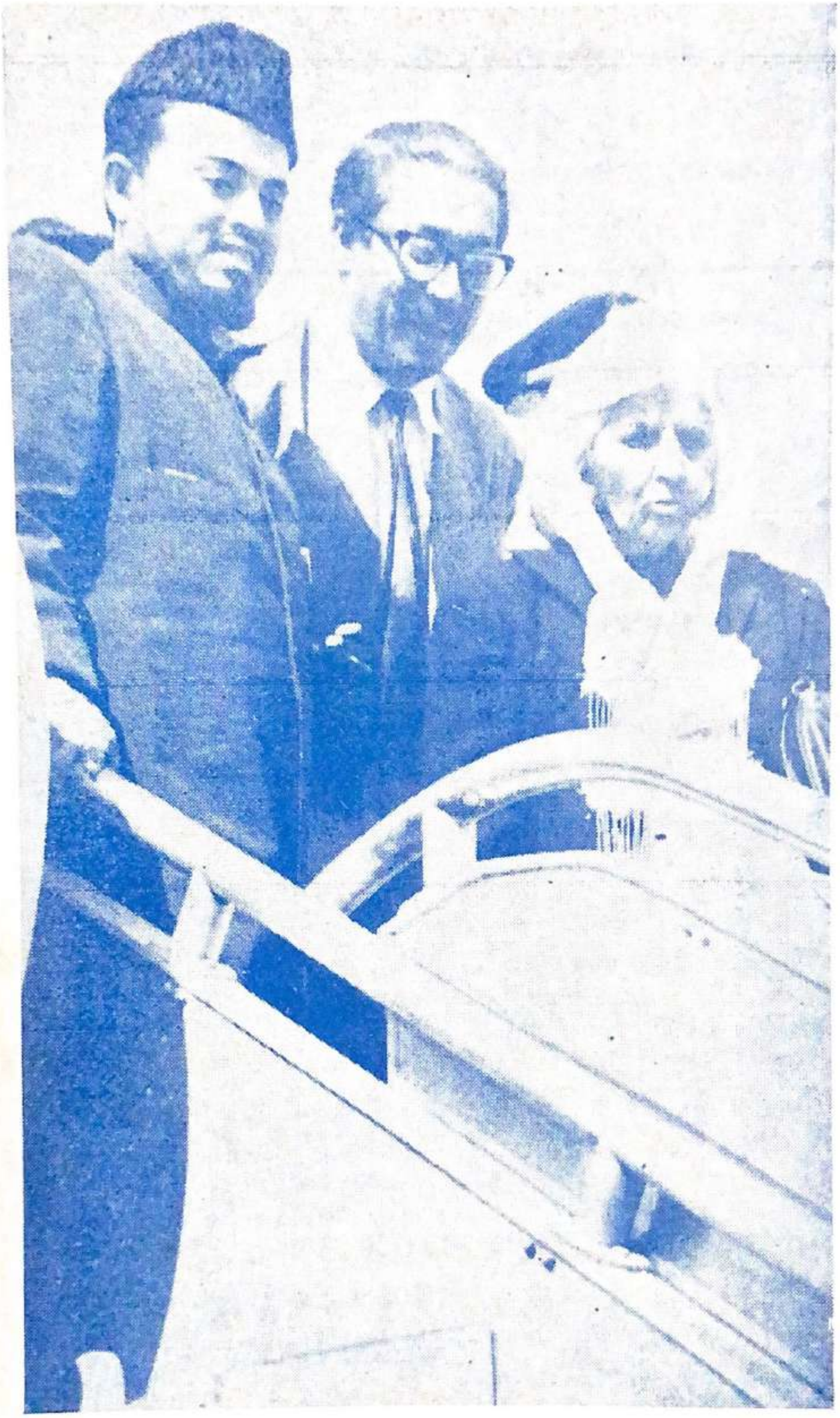

মাদারে মিল্লাত বিমান থেকে অবতরণ করছেন। পেছনে জনাব ফরীদ আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখা যাচ্ছে। ১৮, ১২. ৬৪। : মাদারে মিল্লাত :

> কায়েম রাখার জন্যে দেশের প্রতিটি শিশুও যেন সাহস ও বীরত্বের প্রতীক রূপে গণ্য হয়।'

১৯৪৯ সালের গ্রীষ্মকালে মাদারে মিল্লাত সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন শহর পরিদর্শন করেন। তখন কোহাটের এক সমাবেশে সীমান্তের মুজাহিদগণের বাহাদুরির খুব প্রশংসা করে বল্লেন :

> 'এরা বড়ই কঠিন মুহূর্তে কাশ্মীরের বিপন্ন মুসলমানদের জান-মাল রক্ষার জন্য বীরত্বের সাথে এগিয়ে এসেছিল।'

তার পরে তিনি মুজাহিদগণকে লক্ষ্য করে বল্লেন :

> 'পাকিস্তানের বীর বাহাদুর সন্তান তোমরা! এ তোমাদের জন্য বড়ই গুরুতর পরীক্ষার সময়। দেখবে। তোমাদের মনোবল যেন কমজোর না হয় কোনও মতে।'

কয়েকদিন পর মাদারে মিল্লাত মুজাফফর আবাদে গেলেন। সেখানে তিনি মহিলাদের এক বিরাট সমাবেশে বল্লেন :

> 'তোমরা নিজেদের কলজের টুকরোদেরকে ঈমান ও সত্যের রাহে কোরবান হওয়ার জন্য যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিয়েছ। তোমাদের এই কোরবানী দুনিয়া-আখেরাতে তোমাদের জন্যই অশেষ কল্যাণ বয়ে আনবে। তোমাদের আঁচল তাতে ভর্তি হয়ে যাবে।'

আজাদীর এই পতাকা

১৯৪৯ সালের ১৪ই আগষ্ট।

আজাদী দিবস উপলক্ষে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করলেন :

> 'এটি কাপড়ের টুকরা নয়।

এটি এমনই এক চিহ্ন—যা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতীক।

আমাদের ত্যাগ ও কোরবানীর প্রতীক।

আমাদের আশা-আকাঙক্ষার দ্যোতক।

আমরা চিরদিন এই পতাকা উঁচু করে রাখব।

আর এজন্য আমরা নিজেদের জানমাল সব কিছুই কোরবান করতে বিমুখ হব না মোটেই।'

দেশ রক্ষার প্রশ্নে দূরদৃষ্টি

মাদারে মিল্লাত সেদিনকার সেই বৃটিশ জেনারেলের আইনগত ওজরের তাৎপর্য পুরোপুরিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঃ

পাকিস্তান যদি কারুর উপরে কিছুমাত্র ভরসা করতে পারে—সে হচ্ছে একমাত্র নিজের বাহুবল।

সুতরাং তিনি সর্ব প্রথমে দেশের যুব শক্তিকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে এগিয়ে এলেন। তিনি সংকল্প নিলেন ঃ

দেশ রক্ষার সব দায়িত্ব পাকিস্তানী যুবকদের হাতেই ন্যস্ত করতে হবে। যেন তারা নিজেদের মর্জি ও প্রয়োজন মোতাবেক সব কাজ নিজেরাই করতে পারে।

এই জন্যই তিনি এক যুব সমাবেশে তৎকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন ঃ

> 'পাকিস্তানের যুব শক্তি আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য যথেষ্ট এবং যোগ্যও বটে।
>
> এই দাস মনোবৃত্তি একদম ঝেড়ে মুছে ফেলতে হবে যে বাইরের কোনও লোক আমাদের যুবকদের তুলনায় অনেক বেশী উপযুক্ত।'

পূর্বপাকিস্তানের কচি কাঁচার দল মাদারে মিল্লাতকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে।

: মাদারে মিল্লাত :

তীব্র কষাঘাত

সিভিল ও মিলিটারী দায়িত্ব পাকিস্তানী যুবকদের হাতে ন্যস্ত করার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে, তাই দেখে মাদারে মিল্লাত কঠোর ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন :

> 'পাকিস্তানী যুবকরা কোন দিক থেকেই দুনিয়ার অন্য কোনও এলাকার যুবকদের তুলনায় মোটেই দুর্বল নয় ! জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করার মত যোগ্যতা এদের রয়েছে। বড় বড় পদগুলোতে পাকিস্তানী যুবকদেরকে নিয়োগ না করলে তাদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব ঘটবে। তাদের মধ্যে যে বিপুল প্রতিভা রয়েছে তা বিনষ্ট হবে। আর তাদের মধ্যে হীনমন্যতা বাসা বাঁধবে। যার পরিমাণ মারাত্মক দাঁড়াবে।
>
> যদি সুযোগ দান করা হয়—তা হলে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি যুবক দুনিয়ার যে কোনও দেশের যুবকদের তুলনায় কোনও অংশে দুর্বল কিংবা পশ্চাদপদ বলে গণ্য হবে না।'

সীমাহীন গাফলতি

পাকিস্তান নিজের যুবক তরুণদের সাহস সংকল্প ও ঈমানের জোরের উপরে নির্ভর করে আজাদীর তিনটি বছর অতিক্রম করে চার বছরে উপনীত হল।

অথচ এখনও নওজোয়ানদের জন্য অগ্রগতির পথ বাধা-মুক্ত হল না।

মাদারে মিল্লাত তাদের উপরে এই নির্মম নির্দয় ব্যবহার' উপেক্ষা দেখতে পেয়ে বরদাশ্ত করতে পারলেন না।

তাই তিনি ১৯৫০ সালের ১৪ই আগষ্ট এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে আওয়াজ তুল্লেন :

> 'কোনও স্বাধীন দেশে নিয়ম নীতির প্রতি উপেক্ষা, অনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ আর বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ ও প্রভাব প্রতিপত্তিকে আহ্বান করা—একই কথা।
>
> এ ভাবে ত পূর্ণ স্বাধীনতাকেই অবজ্ঞা করা হয়। যে জন্য আমরা এত কঠিন সংগ্রাম করেছি; এত বিপুল কোরবানী দিয়েছি!
>
> আজাদী হাসিল করা কঠিন কাজ বটে। কিন্তু আজাদী রক্ষা করা তার চাইতেও কঠিনতর।
>
> এসো তোমরা! আজাদীর হেফাজতের জন্য কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাও। আমাদের অগ্রগতির পথে যে সব বাধা বিপত্তি রয়েছে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যেভাবেই তা সক্রিয় হয়ে উঠুক না কেন, তোমরা সে সব দূর করে দাও।'

দেশের যুব শক্তির প্রতি উপেক্ষা অবহেলা লক্ষ্য করে মাদারে মিল্লাত অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি ক্ষমতাসীনদেরকে সতর্ক করে বল্লেন:

> 'বড়ই আফসোস, পরিতাপের বিষয় এই যে সামরিক প্রতিভা যথেষ্ট পরিমাণে মওজুদ থাকা সত্বেও এবং নিজেদের জান-মাল, আবরু ইজ্জতের জন্য আত্মোৎসর্গকারী মুসলমানদের কওম নিজেদের আজাদীর হেফাজতের জন্য পরের উপরে নির্ভর করবে—এটা কেমনতর কথা।
>
> একথা আমি এই প্রথমবার বলছি না। বরং এর আগেও আমি অনেকবারই বলেছি: পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে যথাসম্ভব শীঘ্রই পাকিস্তানীদের পরিচালনাধীনে আনতে হবে।

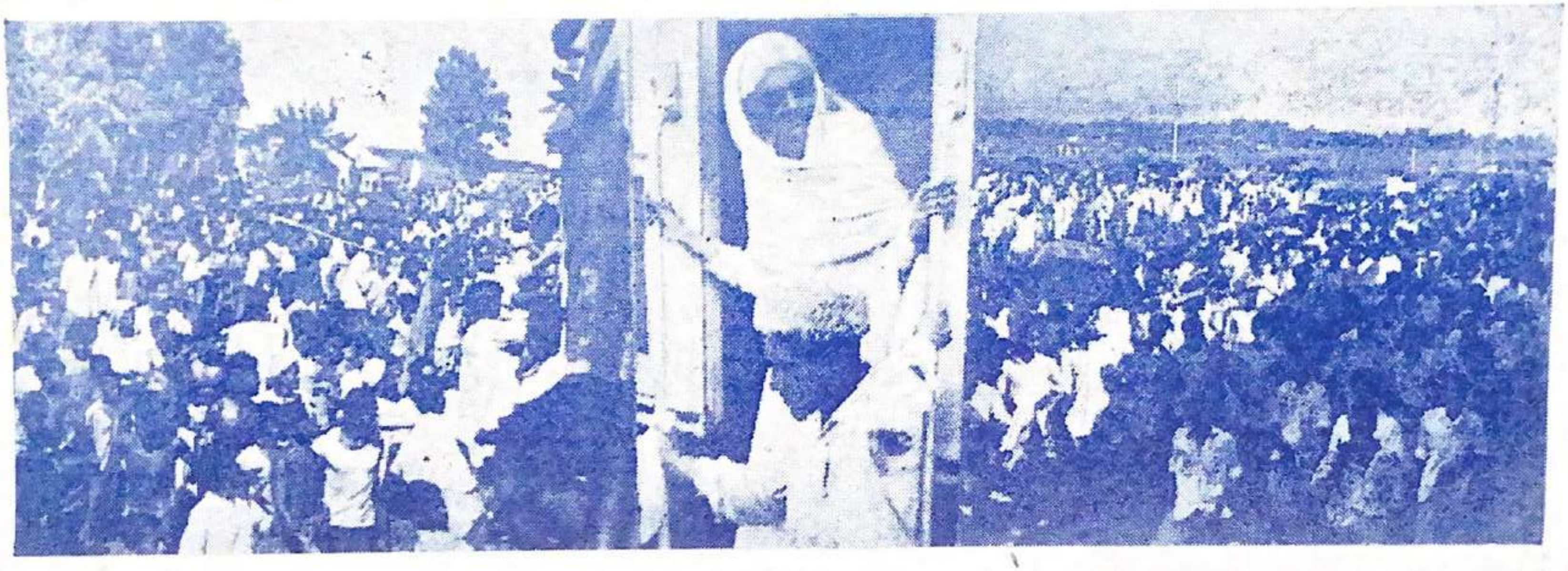

পূর্ব পাকিস্তানে সফররত মাদারে মিল্লাত

> জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে পাকিস্তান অতুলনীয় ধন সম্পদের অধিকারী। আর পাকিস্তানের যুবকগণ দুনিয়ার যে কোনও দেশের যুবকদের সমকক্ষ—তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

মাদারে মিল্লাতের অতন্দ্র সাধনা পরিশ্রম বিফল হতে পারে না।

অবশেষে তাঁরই চেষ্টা যত্নে সরকার পাকিস্তানী যুবকদেরকে গুরুত্বপূণ পদে নিযুক্ত করার কথা মেনে নিল।

মাদারে মিল্লাতের কঠোর সতর্কবাণীর ফলেই দেখা গেল:

> একটি বছর পার না হতেই ইংরেজ কমাণ্ডার-ইন-চীফকে বরখাস্ত করে তার বদলে একজন পাকিস্তানী যুবককে নিযুক্ত করা হল। এভাবে একটি পাকিস্তানী যুবক অফিসার পাকিস্তানের প্রথম প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার মত অপূর্ব গৌরবের অধিকারী হল।

এ সত্য ইতিহাসের অংগ। কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না।

গণতন্ত্রঃ পাকিস্তান ও মাদারে মিল্লাত

পাকিস্তান—আমাদের দেশ।

পাকিস্তান—লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারী ও শিশুর জান কোরবানীর বিনিময়ে হাসিল হয়েছে।

পাকিস্তান—পাক ভারত উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনসাধারণের পৈতৃক বাস্তুভিটা ও বিষয় সম্পদের বিনিময়ে হাসিল হয়েছে।

পাকিস্তান—বর্তমান ভারতের অসংখ্য মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দীনি সংস্থা এবং মুসলমানদের অসংখ্য কীর্তি, মুসলমানদের সম্পদ ও মেহনতে দীর্ঘ কালের সাধনার ফলে প্রতিষ্ঠিত বহু কল্যাণ জনক প্রতিষ্ঠানের বিনিময়ে হাসিল হয়েছে।

পাকিস্তান—বিদেশী বণিক ও স্বদেশী বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থান্ধ নর পিশাচদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের ফলে লুপ্ত আজাদীর পরিপূরক।

এই আজাদীর জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পাক ভারত উপমহাদেশের জনসাধারণকে, বিশেষ করে মুসলিম জনগণকে কত যে কোরবানী দিতে হয়েছে, কত লোক শহীদ হয়েছে, কত মুসলিম নারীর আবরু ইজ্জত নর পিশাচদের হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে, কত ছোট্ট কচি মাসুম শিশু নর পিশাচদের হিংসার শিকারে পরিণত হয়েছে, শুধু এই অপরাধে : ওরা কেন মুসলমানদের ঘরে জন্মাল ?

: এ সবের কোনও হিসাব নেই। আর কোনও দিন তার সঠিক হিসাব কেউ করতে পারবে—তেমন আশাও যে নেই!

আজকের দিনে—আমরা প্রায় সব কথাই ভুলতে বসেছি।

তার কারণ—আজকে যারা দেশ ও জাতির সেবায় দায়িত্বপূর্ণ

মায়ের ডাকে, মায়ের নামে !

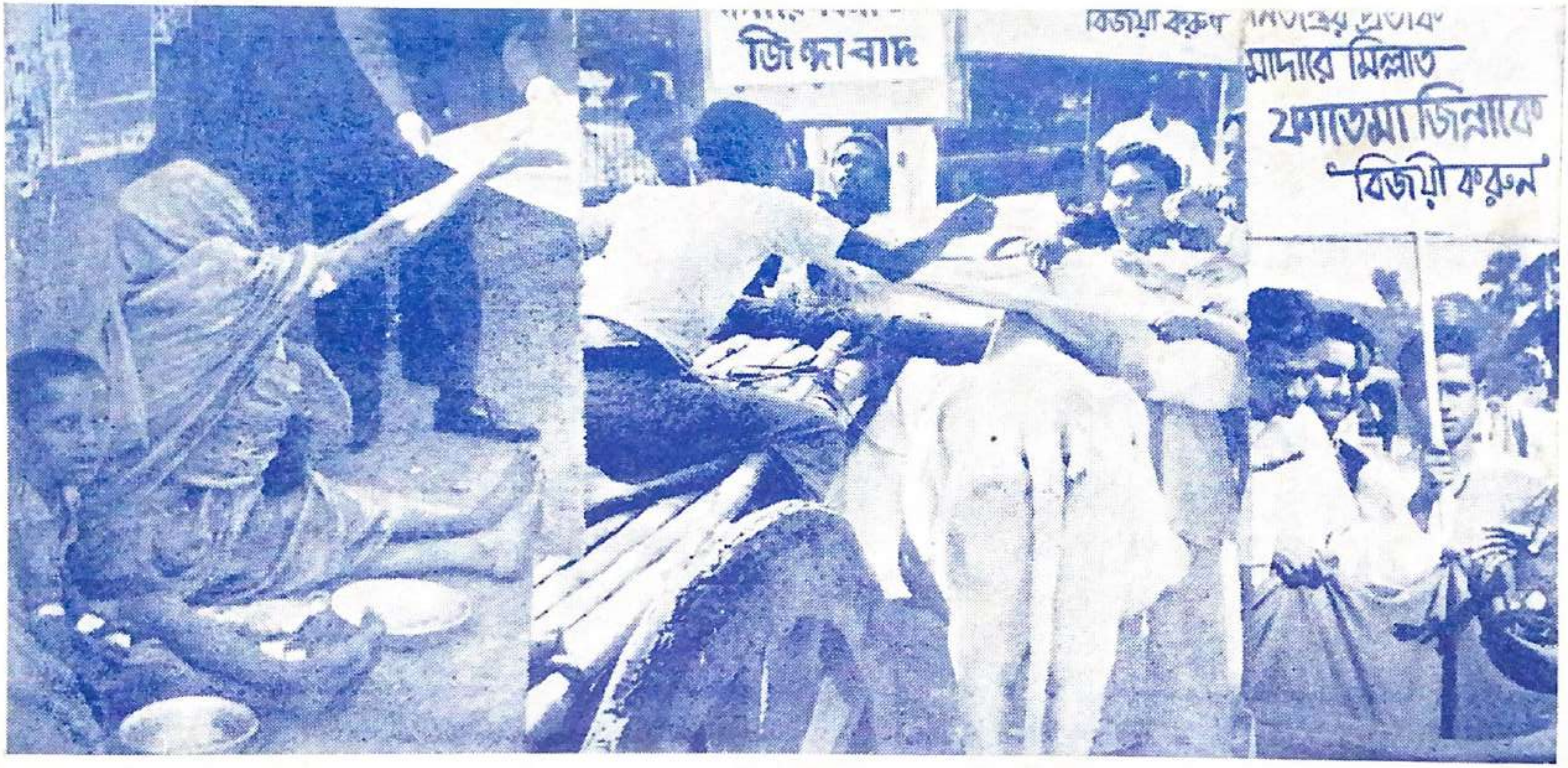
জিন্দাবাদ
বিজয়ী করুন
মাদারে মিল্লাত
ফাতেমা জিন্নাকে
বিজয়ী করুন

পূর্ব পাকিস্তানের পথের ভিখারী, ঠেলা গাড়ী ও রিক্শা চালক, মুটে মজুর এরাও গণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরীক হয়ে দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছেন। বীর বাহাদুর তরুণ ছাত্র সমাজের উদ্যোগে পরিচালিত নির্বাচনী তহবিলে অর্থ সংগ্রহ অভিযানের দৃশ্য।

: মাদারে মিল্লাত :

ভূমিকায় রয়েছেন, সে দিন—এই আজাদী, পাকিস্তান হাসিলের সময়ে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কিশোর তরুণ ছিলেন। আর যারা পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সময়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন, আজকে তারা বার্ধক্যে উপনীত বলা যায়। তখনকার দিনের মুসলমান অফিসারদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইন্তেকাল করেছেন।

এই গতিশীল বিশ্ব চরাচরে কোনও কিছুই যে স্থবির, স্থানু নয়। হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম। সারা দিন—সকাল থাকে না। সারা রাত—সমান অন্ধকার থাকে না। ঠিক তেমনি আমাদের জীবন, পরিবার, সমাজ ও দেশ একই অবস্থায় থাকে না, থাকতে পারে না। গতি আছে বলেই পরিবর্তন ঘটছে সব কিছুতেই। আর এই পরিবর্তনই যে জীবনের লক্ষণ, পরিচয়।

কিন্তু নিজেদের জীবন সম্পর্কে আমাদের মনে আজ কতখানি আস্থাভাব রয়েছে ?

এই পশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই।

আজকের এই উদ্বেগ—কিছু হারানোর কিংবা কিছু না পাওয়ার কারণে নয় মোটেই। বরং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কোথাও সামঞ্জস্য সংগতি বিধানের অবকাশ না থাকায় এই উদ্বেগ অশান্তির সূচনা ঘটেছে।

এই অশান্তির কারণ যাই হোক না কেন—আসলে এরই জন্যে আজাদীর আনন্দ আমাদের জন্য বিষাদে পরিণত হতে চলেছে।

অবশ্য এখানে একটি কথা না বলে উপায় নেই : অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতার কারণেই অসংগতি অসামঞ্জস্য আজকে এত দূর বেড়েছে।

পাকিস্তানের গণমানস আজকে এত অস্থির উদ্বিগ্ন হয়েছে—আজাদীর স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ার কারণেই। এই ব্যর্থতার অনুভূতি

এতখানি তীব্র হয়ে উঠেছে, যাতে আমরা আজকে অনেক বয়স্ক শিক্ষিত লোকের মুখেও শুনতে পাই :

> 'ইংরেজ আমলেও আমাদের দৈনন্দিন
> জীবন এতখানি দুর্বিসহ ছিল না।'

এ কথার অর্থ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে—আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতাই এর মূলে বিরাজমান রয়েছে।

এরই ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি :

> একমাত্র গণতন্ত্রের শর্তে স্বীকৃত পাকিস্তান দাবী যখন বাস্তব রূপ নিল—সেই সূচনাকাল হতে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের নামেই জনগণকে বহুবার ভাঁওতা দেয়া হয়েছে।

এ কাহিনী বড়ই বেদনা দায়ক। আর এই কাহিনীর তিক্ততম অধ্যায় হচ্ছে—বিরোধী দলের প্রয়োজন স্বীকার করা ত দূরের কথা—বিরোধী দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্ষমতাসীনদের চরম রূঢ় ও মূঢ় আচরণ। পাকিস্তান হাসিলের পরে এযাবত কোনও সরকারই গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ ও অংশ বিরোধী দলের প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দান করে নি।

দেখা গেছে :

> ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক বিরোধিতাকে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার কারণেই—ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হিসেবে গণ্য করেছে। যার ফলে একান্ত নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী জন নায়ক ও দেশকর্মীদেরকে নির্বিবাদে—গাদ্দার,রাষ্ট্র দ্রোহী, বিদেশী এজেন্ট ইত্যাদি উপাধি বিতরণে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করা হয় নি।

এরই ফলে ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ এ সবের মধ্যে কোনও রকম পার্থক্য থাকল না। এ ভাবে চিন্তাশীল দেশ-প্রেমিক, বুদ্ধিজীবী সমাজ নিদারুণ মানসিক সংকটের সম্মুখীন হলেন।

আমাদের এই দেশ—পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড বিরোধী দলকে বরাবর এতখানি অসহ্য, মারাত্মক বলে মনে করা হচ্ছে—যাতে নিরাপত্তা আইনের মারফতে বিরোধী দলীয় নেতা, কর্মী ও সংস্থাগুলোকে কাল্পনিক অপরাধের দায়ে সাজা ভুগতে হয়। আমাদের ঐতিহ্য যখন এই ই, তখন আর আমরা কিভাবে আশা পোষণ করতে পারি—আমাদের এই দেশে কোনও রাজনৈতিক সংস্থা নির্বিবাদে সুসংবদ্ধ ভাবে গণ সংযোগ অভিযান চালিয়ে জনগণমনে চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবে।

অথচ গণচেতনাই যে গণতন্ত্রের মূল উৎস, মেরুদণ্ড। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন দলের কর্তারা এ কথা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম নন:

> পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ যদি কায়েদে আজমের ডাকে সাড়া না-ই দিত, তারা দায়িত্ব সচেতন—একথা যদি প্রমাণ করতে না-ই পারত, তা হলে আজকের এই পাকিস্তান বাস্তব রূপ নিত কিভাবে?

গোমরাহির আবর্ত

দায়িত্ব হীনতার ফলে জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও জনগণের অধিকার সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতির অভাব ঘটলে—রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি কিংবা দল ধীরে ধীরে স্বৈরাচারের পথে এগিয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে এমন অবস্থা দেখা দেয়—যাতে ক্ষমতাসীন দল জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ কায়েম করার মত সৎ সাহস হারিয়ে ফেলে। আর তখন জনমতের প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত ক্ষমতাসীনদের কাজ দাঁড়ায় প্রশাসনিক কর্মচারীদের বুদ্ধি বিবেচনা তথা দয়ার উপরেই নির্ভর করা। এ ছাড়া গুটি কতক চাটুকারের স্তোকবাক্যের মূলধন নিয়েই এদেরকে রাজনৈতিক কারবার চালু রাখতে হয়।

দেশের জনসাধারণ কি হালে দিন কাটাচ্ছে ? তাদের প্রকৃত সমস্যা কি ? এ সব নিয়ে কোনও কথা বলার মত লোক সারা দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি কোথাও এমন ধরণের কোনও লোক থাকেও, তবে তার মুখে স্বৈরাচারী আইনের তালা লাগিয়ে দেয়া হয়।

দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এমন এক শ্বাস-রুদ্ধকর অবস্থার সম্মুখীন হন, যাতে তাদের মন-মস্তিষ্ক, বিবেক-বুদ্ধি নিস্তব্ধ প্রাণহীন হয়ে যায়। যার ফলে তাদের কাছে নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবেক-বুদ্ধি সম্পূর্ণ বেকার বরং দুর্বিসহ বোঝা বা অপরাধ বলে গণ্য হয়। জাতীয় পর্যায়ে এর চাইতে বিড়ম্বনা আর কীই বা থাকতে পারে !

শুধু তাই নয়—এমন অবস্থার সুযোগে ঘৃণ্য পুঁজিপতিরাও নিজেদের খেয়াল খুশী মোতাবেক দু'হাত ভরে মুনাফা লুটতে থাকে। শুধু তাই নয়—সমাজ দুশমনরাও যা খুশী তাই করতে লেগে যায়। এমন কি আইনের চোখেও তারা ধূলা নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

এক দিকে দেশের জনমতকে চরম উপেক্ষার পাত্র, চেতনা হীন ও অসহায় বলে ঘোষণা করা, অপর দিকে গণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে ফেলা এবং ক্ষমতার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে মতলব হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া, আর বে-আইনী মুনাফাখোর ও সমাজ দুশমন চক্রকে বাস্তব স্বীকৃতি দানের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়—তাতে আইন, বিধান, নিয়ম-নীতির কোনও মর্যাদাই টিকতে পারে না।

কোনও দেশে রাজনৈতিক নিস্তব্ধতাকে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বলে আখ্যা দান করা, দেশের নিরাপত্তার প্রমাণ বলে গণ্য করা চরম ধৃষ্টতা ও গণতন্ত্রের প্রতি নিদারুণ উপহাস ছাড়া আর কীই বা হতে পারে।

অথচ দুনিয়ার সভ্য সমাজ একথা অনেক আগেই মেনে নিয়েছে :

> প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়—সরকার ও সরকারী যাবতীয় সংস্থা সংগঠনের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে : যাদেরকে নিয়ে সমাজ গড়ে উঠেছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে ব্যক্তিগত প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশের পথ বাধা-মুক্ত করা, প্রশস্ত করে দেয়া ।
>
> প্রকৃত গণতন্ত্রের লক্ষ্য বস্তু : অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়া নয় মোটেই । বরং এমন আন্দোলন ও সংগঠন মজবুতভাবে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তি-মানুষের সাথে সরকারের যে ব্যবধান, দূরত্ব রয়েছে—তা উল্লেখ-যোগ্য ভাবে কমিয়ে আনা যায় । সংগে সংগে ব্যক্তি মানুষের সম্মান, মর্যাদা, অধিকার বাড়িয়ে তোলা । তাকে এমন একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভের সুযোগ করে দেয়া যে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তারও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।

তবে এ কথাও সত্য যে প্রগতিশীল কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলিষ্ঠ ও কিছুটা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন দেখা দেয় । কিন্তু কোনও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের অবর্তমানে সেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গণ-অধিকার অপহরণের কাজেও ব্যবহার হতে পারে । এমন আশংকা অবশ্যই রয়েছে ।

কোনও ব্যক্তি বিশেষের চিন্তাধারা, কার্যক্রমের প্রতি নিরংকুশ আস্থা, চিত্তাকর্ষক শ্লোগানের জনপ্রিয়তা আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক নিয়ম শৃঙখলার দ্যোতক বলে মনে হয় । মনে হয় যেন দেশে একটা স্থিতিশীলতা পয়দা হয়ে গেছে । কিন্তু এভাবে সামাজিক

পর্যায়ে স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ও নৈতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তার কুফল যেমন মারাত্মক, তেমনি সুদূর প্রসারী।

কালক্রমে বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপরে বে-লাগাম আস্থা ও নির্ভরশীলতা এতখানি বেড়ে যায়, যাতে জনসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতাও হারিয়ে বসে। এমন কি কিছুদিন পরে যদি জনসাধারণের চিন্তাধারা ও মনোভাব পর্যালোচনা করা হয়, তবে দেখা যাবে : জনগণের বিপ্লবী সংকল্প, আকাঙখা—পরাজয়ের আশংকায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

গণতন্ত্রই জনগণকে পরাজয়ের আশংকা ও হতাশার ঘনঘোর অন্ধকার থেকে টেনে বাইরে—আলোর পথে, জিন্দেগীর পথে নিয়ে আসে। এরই জন্য গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের বদলে রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র বা মেনিফেষ্টোর উপরেই বিশেষ ভাবে জোর দেয়া হয়।

একটু চিন্তা করলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারব :

যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা দীর্ঘ-দিনের গোলামীর নাগ-পাশ ছিন্ন করে আজাদী লাভ করেছি, পাকিস্তান কায়েম হয়েছে—আমাদের সেই জাতীয় মূলধন—গণতন্ত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে আসছে সমানে।

গত সতের বছরের জাতীয় ইতিহাস তারই গ্লানি বয়ে আসছে।

মাদারে মিল্লাতের ভূমিকা

বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে মাদারে মিল্লাতের ভূমিকা, কর্ম তৎপরতা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। আমরা স্পষ্ট রূপেই দেখতে পাচ্ছি :

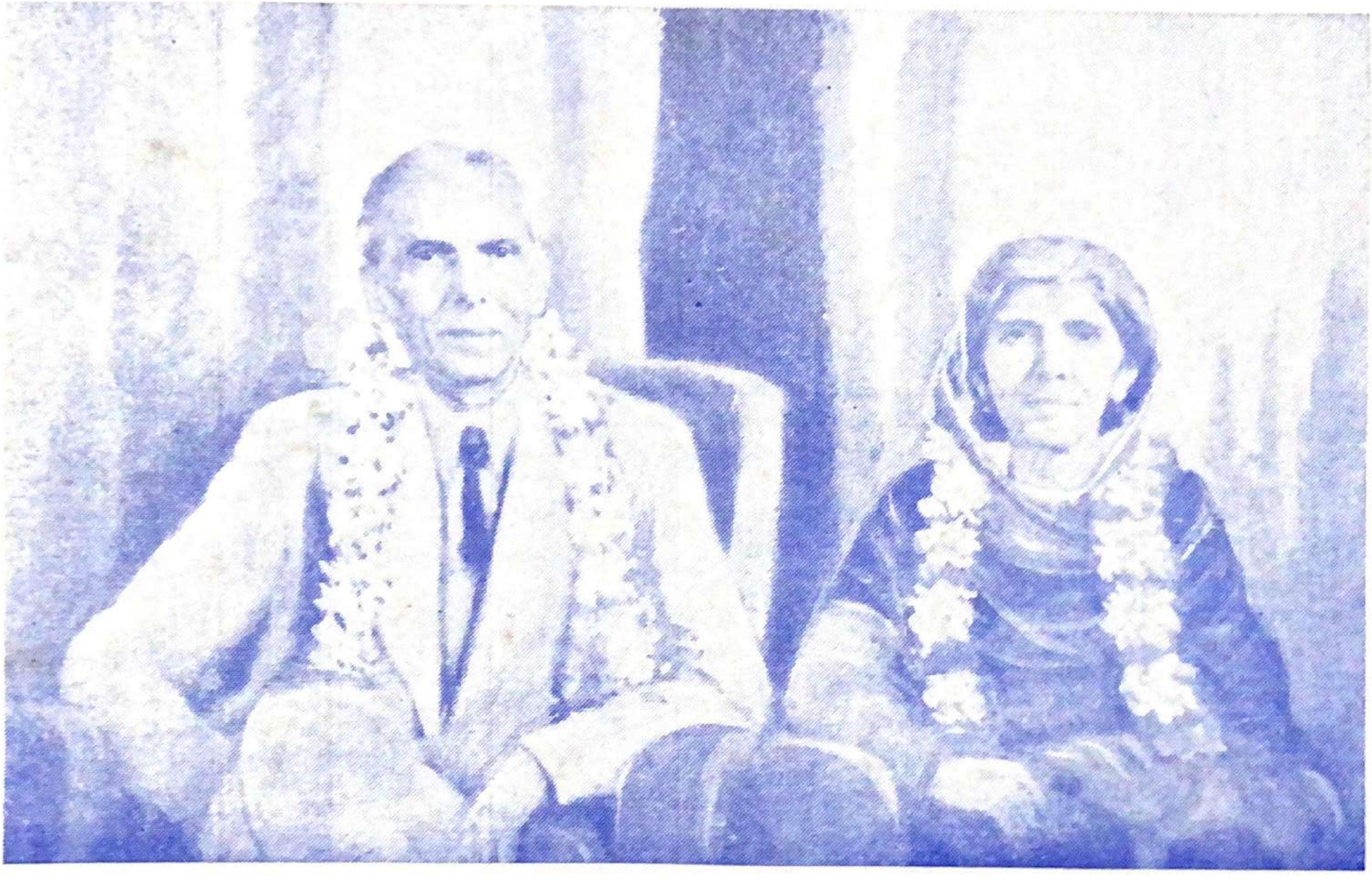

> কায়েদে আজমের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি মূহূত মাদারে মিল্লাতের চোখের সামনেই অতিবাহিত হয়েছে। আর তিনিও যে তাঁর ভাইয়ার স্বপ্ন-সাধ বাস্তবে পরিণত হোক, তাঁর আশার তরী সাফল্যের তীরে উপনীত হোক —এ ছাড়া আর কোনও আশাই পোষণ করেন নি।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে প্রশান্ত উদার চিত্তে কায়েদে আজমের আমানত মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানকে কওমের হাতে ন্যস্ত করে দিলেন।

তাঁর আশা ছিল: মুসলিম লীগের নেতারা কায়েদে আজম ও মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা মোতাবেক পাকিস্তানকে একটি জনকল্যাণ ভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

কিন্তু তাঁর সে আশা ভংগ হল বড়ই নির্মম ভাবে। তিনি দেখলেন:

> ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মারফতে জনগণের ক্ষোভানলে—অবশ্য তৎকালীন ক্ষমতাসীন নেতাগণের অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা অদূরদর্শিতা, রুঢ়তা ও মূঢ়তা এবং গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম হিসেবে কায়েদে আজমের হাতে গড়া মুসলিম লীগ বরবাদ হয়ে গেল। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মাধ্যমে অর্জিত পাকিস্তানের বুকে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের ফলে স্বৈরাচারী দানব শক্তি প্রলয় কাণ্ড ঘটাতে লাগল।
>
> কায়েদে আজম নিজের জীবন পণ করে—মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে আজাদীর প্রাণ-বন্যা তুলেছিলেন। বোবা মুখে তিনি গগন বিদারী তাকবীর ধ্বনি তুলেছিলেন। আধমরা লাশের মত অসহায় মজলুম জনগণের বুকে প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁরই সার্থক স্মৃতি বহন করছিল মুসলিম লীগ। সেই

মুসলিম লীগ ধ্বংস হয়ে গেল—পংগু অথর্ব নেতাদের—গণতন্ত্রের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিক্ষুব্ধ জনতার রুদ্র রোষে।

তিনি দেখলেন :

সেই নির্বাচনের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ফলাফল গণতান্ত্রিক বিশ্বে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু গণবিরোধী চক্রের কাছে তা অসহ্য হয়ে উঠল। তারা পাকিস্তানের বুকে নবজাত গণতন্ত্রের পিঠে ছুরিকা হানবার জন্য মারমুখো হয়ে উঠল। গণজাগরণের প্রবল উচ্ছাস ৯৩ ধারার বজ্রশেল নিক্ষেপ করে স্তব্ধ করা হল।

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মূল অংকুর গণপরিষদকে গলা টিপে হত্যা করা হল।

তারপরে আরও কত কাণ্ড ঘটে গেল।

অবশেষে মার্শাল ল'য়ের বোবা ভূত এসে জনগণের বুকে চেপে বসল।

এ সব আমাদের জাতীয় জীবনে চরম দুঃস্বপ্নের মতই ঘটে গেল!

শুধু তাই নয়—গণতন্ত্রের মাধ্যমে অর্জিত পাকিস্তানের বুকে জনগণমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গণ-ঐক্য সমূলে ধ্বংস করার কুমতলবে আত্ম-কেন্দ্রিকতার মারাত্মক বিষ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হল।

তারই ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি :

গত সতের বছর ধরে যে ভাবে হোক 'দু'টো পয়সা কামাই করে নাও' এমন বিকৃত ভাবধারাকে সব রকমে পরিপুষ্ট করা হয়েছে।

মানবতা, সভ্যতা, শালীনতা, সত্য ও আদর্শ নিষ্ঠা—একদিন যে সব আমাদের ঈমানের অংশ ছিল, যে সব আমাদের গর্বের বস্তু

ছিল, আজ তা আমাদের সমাজে অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে (নাউজু বিল্লাহ)। মজলুমের সমর্থন, জালিমের প্রতিরোধ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ—এ সব আজকে আমাদের জন্য ছওয়াবের কাজ নয়; ঈমানের অংগ নয়, আল্লাহ রাছূলের হুকুম নয়, (নাউজু বিল্লাহ) বরং নির্বুদ্ধিতা বলেই গণ্য হচ্ছে!

আর কেনই বা হবে না—যে সমাজে যে দেশে—নিজ বান্দাদের প্রতি আল্লার দেয়া গণ-অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতে পারে, চলতে থাকে—সে দেশে, সে সমাজে সৎ ও মহৎ বলতে যা কিছু বুঝায়, তা যে কিছুতেই টিকতে পারে না।

এখানে বলা যেতে পারে :

> দেশবাসীর প্রতি উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা দেখিয়ে যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করল, তারাই বিদেশী সাহায্যের নামে এমন সব আবর্জনা আমদানী করতে লাগল, যাতে আমাদের মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক পরিবেশ বিকৃত ও নাপাক হয়ে উঠল।
>
> চরিত্র, নীতি —এ সবের কোনও ঝামেলা বাকী রইল না। শালীনতা, সভ্যতা আবরু ইজ্জত সব কিছুই যে গণ-বিরোধী চক্রের দাপটে বরবাদ হতে চলেছে।

কিন্তু পাকিস্তানী জনগণের সৌভাগ্য বলতে হবে :

> মাদারে মিল্লাত আজও বেঁচে রয়েছেন—তিনি কখনও বিবেক ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বরদাশ্ত করতে পারেন নি। সে ধাতের মেয়ে তিনি মোটেই নন।

এ কথার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। একবার নয়, বহুবার দিয়েছেন।

> স্বৈরাচারের ভ্রূকুটি, রক্ত চক্ষু তাঁর কণ্ঠ নিস্তব্ধ করতে পারে নি।

তাই ত তিনি ক্ষমতাসীনদের কাছে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারিণী। আর

দেশবাসী জনগণের কাছে একান্ত আপন জন—
মাদারে মিল্লাত।

মাদারে মিল্লাত গণবিরোধী চক্রের হীন কারসাজি দেখছিলেন। আর এই অধোগতির প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে নিদারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করল। তাই ত দেখা যায়: ১৯৫৪ সালের পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে বরাবর ডাক দিয়ে আসছেন।

সারা দেশে একক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী মাদারে মিল্লাত যেভাবে শাসকদেরকে বরাবর হুশিয়ার করে আসছেন, তাতে সংশ্লিষ্ট সবাই যদি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু মাত্র সতর্ক সচেতন হতে পারত, তা হলে দেশের অবস্থা কিছুতেই এতদূর নীচে গড়াতে পারত না।

তিনি অত্যন্ত সংগত কারণেই বোধ হয় এই ধারণা পোষণ করে আসছিলেন যে সরকারী শাসনযন্ত্র সঠিকভাবেই ঈমানদারীর সাথেই ব্যবহৃত হবে। আর দেশবাসী জনগণ নিজেদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে ক্রটি করবে না মোটেই। মোট কথা তিনি আশা করেছিলেন: প্রত্যেকটি পাকিস্তানী নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে থাকবে। তাই তিনি যখনই প্রয়োজন অনুভব করেছেন, নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পিছপা হন নি মোটেই। তাতে কোনও রকম দ্বিধা-সংকোচের নাম নিশানাও পাওয়া যাবে না।

দেশের জনগণকে তিনি নিজ সন্তানের মতই মনে করেন। আর এমন অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে এখন। আর দেশবাসী সেকথা স্বীকারও করছে।

তাঁর এই অনন্য অসাধারণ বিরাট ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে সেই আট বছর বয়স থেকে শুরু করে কায়েদে আজমের ইন্তেকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের অতি ঘনিষ্ঠতর সাহচর্যের ফলে। কায়েদে

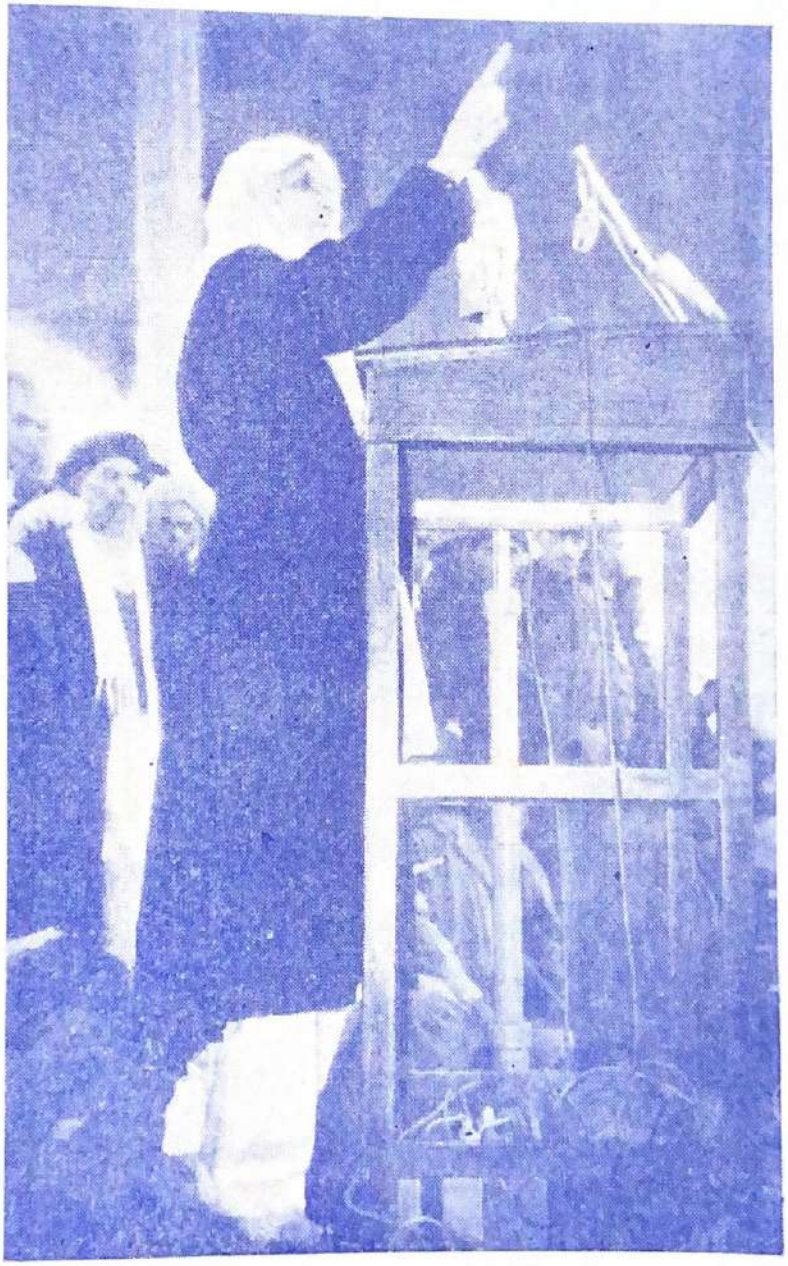

"আয় তোরা আয় ...." : মাদারে মিল্লাত :

আজমের রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা তিনি প্রত্যক্ষভাবেই লক্ষ্য করেছেন।

> 'দি গ্রাণ্ড ওল্ডম্যান অব ইণ্ডিয়া'—দাদা ভাই নওরোজী ও গোখলে প্রমুখ রাজনৈতিক দিকপালদের সাথে কায়েদে আজমের ঘনিষ্ঠতা, ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তাঁর কর্ম তৎপরতা, লখনৌ প্যাক্ট সম্পাদনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা, তা ছাড়া লর্ড উইলিংডনের সাথে তাঁর সংঘর্ষ, অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে মিঃ গান্ধীর সাথে মতবিরোধ ও সারা দেশ ব্যাপী তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল প্রচারণা, নেহেরু রিপোর্টের মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া—যার ফলে কায়েদে আজম ভগ্নোৎসাহ হয়ে দেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ড চলে গেলেন—এত সব ঘটনা মাদারে মিল্লাত অতি ঘনিষ্ঠভাবেই লক্ষ্য করেছেন এবং এ সব ঘটনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তাঁর মন মস্তিষ্কেও সূচিত হয়েছে।

তারপর কায়েদে আজম আল্লাহ তায়ালার উপরে ভরসা করে ভারতে ফিরে এলেন, আর তাঁরই আহ্বানে মুসলিম ভারত জেগে উঠল। অবশেষে মজলুম মুসলমানরা আজাদী লাভ করল, পাকিস্তান কায়েম হল—জাতীয় ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে মাদারে মিল্লাতের ভূমিকায় কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। তিনি বরাবর কায়েদে আজমের পাশে দাঁড়িয়ে প্রেরণা দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন।

ভাই বোন ঃ মধুর সম্পর্ক

মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের আরেকটি বিশেষ দিক ঃ আমাদের এই পাক-ভারত উপমহাদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির চিত্তাকর্ষক হৃদয়গ্রাহী অন্যতম বৈশিষ্ট্যের জীবন্ত প্রতীকরূপে তিনি অতুলনীয় গৌরবের

অধিকারিণী।

তা হল ভাই-বোনের মধ্যেকার অনুপম সম্পর্ক।

আমাদের লোক-সংগীত, লোক-সাহিত্য, এই অনুপম মধুর কাহিনীতে ভরপুর।

বোনের মনে ভাইয়ের জন্য কত ভালোবাসা, প্রেম আকর্ষণ থাকতে পারে, এখানের এই মমত্ববোধ কত উঁচু পর্যায়ের—সে কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠেছে মাদারে মিল্লাতের ব্যক্তিত্বে, চরিত্রে।

তিনি অসাধারণ ভাইয়ের অনন্য-সাধারণ সহোদরা হিসেবে নিজ সত্তাকে ভাইয়ের জন্য বিলীন করে দিয়েছেন। মাদারে মিল্লাতের জীবনে—এ হচ্ছে পরম সাফল্য।

দুনিয়ার ইতিহাসে এমন ক'টি বোনের সন্ধান পাওয়া যাবে—যাঁরা ভাইয়ের জন্য নিজেদের জীবন এভাবে উৎসর্গ করতে পেরেছেন!

নিশ্চয়ই মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাই-বোনের মধ্যেকার এই পবিত্রতর সম্পর্কের মধুরতর কাহিনী এতই দুর্লভ অমূল্য সম্পদ যে সাধারণভাবে তা কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগল, মাদাম কুরি কিংবা ফাতেমা জিন্নাহর মত ব্যক্তিত্বের গৌরব অর্জন করার মত সৌভাগ্য ত আর সবার হয় না!

> পাকিস্তান হল—কায়েদে আজমের আজীবন সাধনার সফল পরিণতি। আর কায়েদে আজম নিজে ছিলেন এমনই এক বোনের 'ভাইয়া'—কাম্য বস্তু বলতে যাঁর জীবনে আর কিছুই ছিল না।
>
> সুতরাং এমন বোনের পক্ষে ভাইয়ার কীর্তি-চিহ্ন সম্পর্কে উদাসীন হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না।
>
> মাদারে মিল্লাত নিজ চোখে দেখেছেন:
>
> কায়েদে আজমের আসনেই গোলাম মোহাম্মদ ও

গণতন্ত্র
মাদারে মিল্লাত জিন্দাবাদ
MOTHER-E-MILLAT
FATEMA

রাজশাহীতে মাদারে মিল্লাতের সংবর্ধনা।

> সিকান্দার মির্জ্জার মত লোক গবর্ণর জেনারেল হিসেবে বসেছে।
>
> এক দিন যারা বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, তারা কিভাবে হোঁচট খেয়ে বেড়াচ্ছে।
>
> প্রশাসনিক যন্ত্রে তিনি ঘুষ দুর্নীতির মরচে ধরতে দেখেছেন। জনগণের জান-মালের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানে গুটি কতক বিত্তশালী লোকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, আর জনসাধারণের রক্ত—পানির চাইতেও সস্তা হতেও তিনি দেখেছেন।

কিন্তু, মাদারে মিল্লাত মহান ভাইয়ের পরম আদরের বোন, দীর্ঘকালের দীক্ষাপ্রাপ্ত বোন হিসেবেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অতুলনীয় নজীর কায়েম করলেন। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও গবর্ণর জেনারেল, প্রধান মন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেণ্টকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। তিনি তা করেন নি। কারণ গণশক্তির উপরে তাঁর মনে অটুট আস্থা রয়েছে। জনগণের প্রতি তাঁর মনে অসীম মমত্ববোধ ও বিশ্বাস রয়েছে।

শুধু একটি বার তিনি যখন দেখলেন ঃ তাঁর মহান ভাইয়ের প্রথম কীর্তি-চিহ্ন মুসলিম লীগের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তখনই তিনি ময়দানে এসেছিলেন। আর কোনও উদ্দেশ্যে নয়— ক্ষমতা লাভের প্রতি তাঁর কোনও আগ্রহ নেই, সে কথা তিনি সেবারেও প্রমাণ করেছেন। সে যাই হোক তিনি সেবারে পষ্ট অনুভব করতে পারলেন ঃ মুসলিম লীগ নামধারীদের কতদূর পতন ঘটেছে।

ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব : মাদারে মিল্লাতের ব্যক্তিত্বে

আমাদের ধর্ম—ক্ষমতার আসন দখলের জন্য মোটেই উৎসাহ দেয় না।

পেয়ারা নবীজী (দঃ) পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দান করেছেন :

'তোমরা ক্ষমতার আসন দখলের জন্য আকাঙ্খা করো না।'

এ কথার অর্থ হচ্ছে : মুসলমান সমাজ যাতে 'তাকওয়া' বা পরহেজগারীর উপরেই কায়েম এবং দুর্নীতি-মুক্ত থাকতে পারে। আর আদর্শ-নিষ্ঠ নেতৃত্বের বিকাশ যেন সম্ভব হয়।

এ দিক থেকেও মাদারে মিল্লাতের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবময়।

তিনি জীবনে কখনও, এমন কি কায়েদে আজমের ইন্তেকালের পরেও ক্ষমতা লাভের আশা প্রকাশ করেন নি। বরং তিনি বারবার নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করেছেন :

'তোমরা যে পথে যাচ্ছ—সেটা কায়েদে আজমের পথ নয়।'

তাঁর ধারণা ছিল :

নেতারাও হয়ত শুধরে নেবে নিজেদেরকে।

নতুবা যারা নিজেদের ভোটে আজাদীর প্রতীক—পাকিস্তান অর্জন করেছে, সেই জাগ্রত জনমত তাদেরকে সোজা পথে চলতে বাধ্য করবে।

কিংবা হয়ত এরই মধ্যে পরিপূরক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে—জনগণের মধ্য হতে।

এতে প্রমাণ হচ্ছে : তিনি জাতির উপরে কতখানি আস্থাবান, আশাবাদী।

অবশেষে মাদারে মিল্লাতের ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল। পাকিস্তানের জনগণ যেভাবে দীর্ঘ সতের বছর ধরে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত হয়ে আসছে, তাই দেখে বড় দুঃখ-বেদনা-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাজনীতির ময়দানে অবতরণ করলেন।

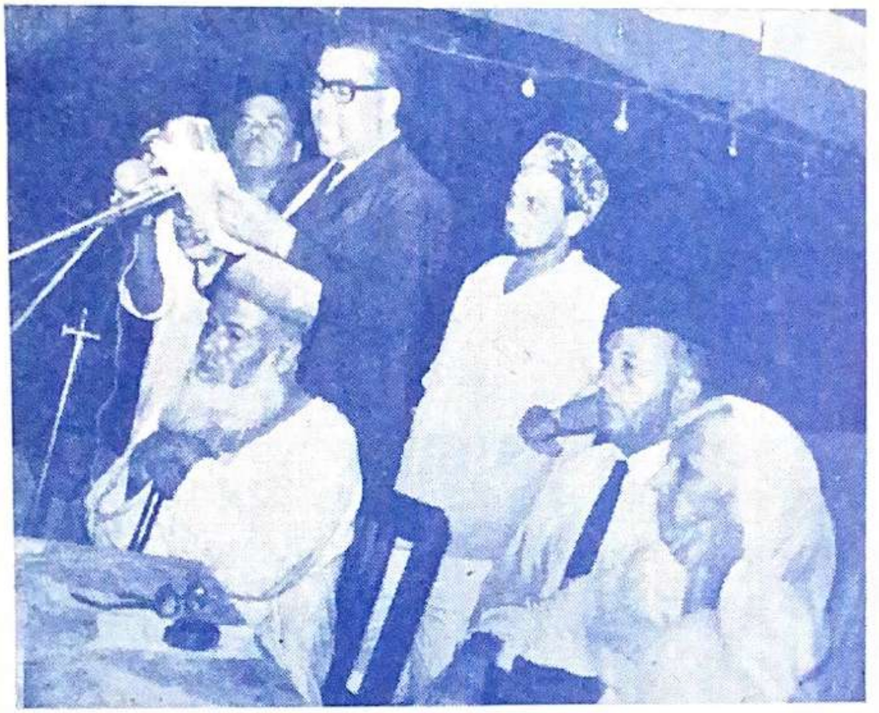

মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লালদিঘী ময়দানে প্রদত্ত নাগরিক সংবর্ধনা সভার দুইটি দৃশ্য। উপরের ছবিতে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব এস, এ, সিদ্দিকী বার-এট-ল মানপত্র পেশ করছেন। সভাপতির পার্শে জনাব আজম খান ও মাদারে মিল্লাত বসে রয়েছেন। নীচের ছবিতে মাদারে মিল্লাতকে বিশেষ উৎফুল্ল দেখা যাচ্ছে।

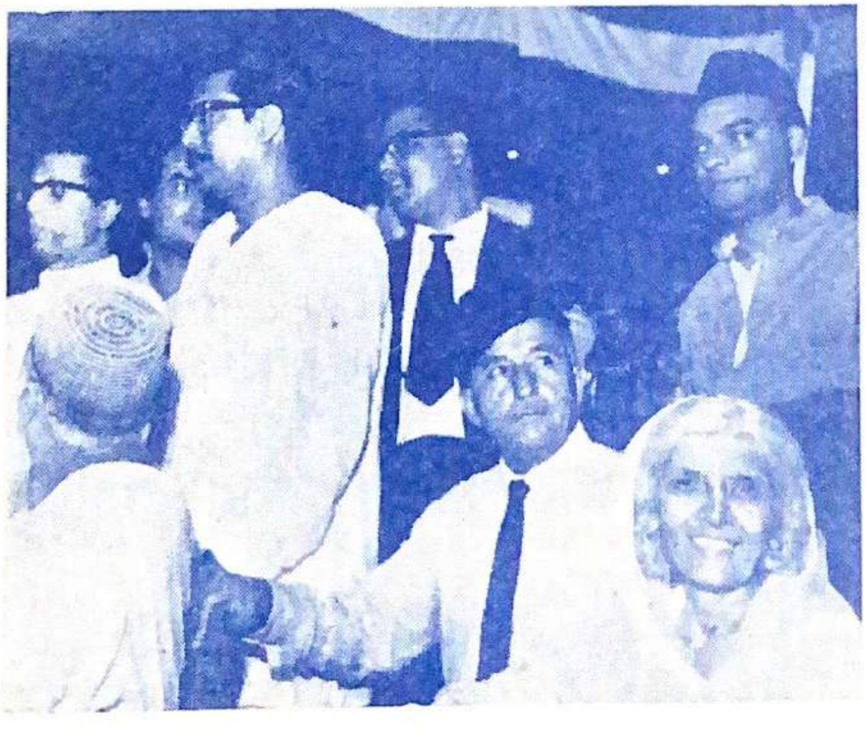

—জনাব মইদুর রহমান চৌধুরীর সৌজন্যে।

তিনি দেখলেন :

> প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব যে শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন—তাতে তিনি স্বয়ং স্বৈরাচারী শাসনকর্তার ভূমিকাই নিয়েছেন।
>
> তারই মনোনীত মন্ত্রী ও গবর্ণরগণ শুধু তার কাছেই জবাব-দিহি করতে বাধ্য।
>
> আর কথায় কথায় অর্ডিন্যান্স জারী করে গায়বা মুখোশ ছেড়ে তিনি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে না করলেও চলবে—আশা করি।

> কিন্তু মাদারে মিল্লাত যখন স্পষ্টরূপে দেখতে পেলেন : গোটা জাতিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে। যার ফলে কোনও প্রকার গণতন্ত্রের বিকাশ আর মোটেই সম্ভব নয়। ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে শ্রমিক মজুরদের মনেও বিভীষিকা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে।
>
> ঘুষ ও দুর্নীতির দরজা এতখানি প্রশস্ত হয়েছে—যা দিয়ে একপাল হাতী পেরিয়ে গেলেও কেউ তা টের করতে পারবে না। মার্শাল ল'-এর মারফতে জনগণের মনে এতখানি ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে, যার ফলে লোকজন নিজেদের ঘরের মধ্যে বসেও মনের কথা খুলে বলতে সাহস পায় না—এমনই এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।
>
> যেন—জাতির বুকের উপরে এক বোবা ভূত চেপে বসেছে।
>
> যেন—সারা দেশে গোরস্তানের নিস্তব্ধতাই কেউ টেনে আনতে চায়।

মাদারে মিল্লাত দেখলেন :

বন্যার পানি নাকের উপরে পৌঁছে গেছে।

কায়েদে আজম কক্ষনো পাকিস্তান এজন্য হাসিল করেন নি : জনগণ না খেয়ে থাকবে, অথচ টু শব্দটিও করতে পারবে না।

খায়বর গিরিপথ থেকে চট্টল এলাকা পর্যন্ত 'ভূতে পাওয়া' অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

সাবেক নেতাদের মধ্যে এমন কেউ বেঁচে নেই যে নাকি সাহসে বুক বেঁধে জনগণের পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে।

শেরে বাংলা বেঁচে নেই।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সিপাহসালার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বেঁচে নেই।
মওলানা ভাসানী বৃদ্ধ অবস্থায়।
খাজা নাজিমুদ্দীনও একই অবস্থার সম্মুখীন ছিলেন।
গণতন্ত্রের শিবির নিষ্প্রাণ, নিশ্চল, নিস্তব্ধ প্রায়।
পাকিস্তানের জনগণ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

তাই দেখা গেল :

আজ থেকে ৩০ বছর আগে পাক-ভারত উপমহাদেশে একবার কায়েদে আজম যেভাবে বিরাট চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিলেন, ঠিক তেমনি সাহস, বীরত্ব ও শক্তির প্রতীকরূপে মাদারে মিল্লাত রাজনীতির ময়দানে নেমে এলেন।

মাদারে মিল্লাতের এই সিদ্ধান্ত কত বিস্ময়কর, যুগান্তকারী তাই দেখুন।

জাতির প্রত্যেকটি নারী, শিশু, যুবক-বৃদ্ধকে তাঁর শুধু একটি ঘোষণা কিভাবে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছিল।

মাদারে মিল্লাতের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কচি কিশোর মাসুম শিশুরা দু'হাত তুলে মোনাজাত করছে।

: মাদারে মিল্লাত :

মনে হল—যেন মরা গাঙে জোয়ার এসেছে, বান ডেকেছে—তাঁরই ডাকে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মাদারে মিল্লাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আরেকটি গৌরবময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

তিনি এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে গোটা কওমকে সামাল দিলেন ঃ

> যখন গণমানস চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন ছিল। ব্যক্তি ও কর্মনীতি তথা আদর্শের মধ্যে কোনও রকম পার্থক্য অনুভব করার মত শক্তি, অনুভূতি দেশের জনগণ হারিয়ে ফেলেছিল।
>
> মাত্র কয়েক মাস আগেও জনসাধারণ দেশের রাজনীতির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন নির্বিকার অবস্থায় কাল কাটাচ্ছিল। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা মরচে ধরা অবস্থায় পৌঁছেছিল। গণতন্ত্রের কাফেলা মঞ্জিলের দিকে এগোনর বদলে পিছিয়ে পড়ছিল।

কিন্তু মাদারে মিল্লাতের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথেই যেন গোটা কওম জেগে উঠল। প্রত্যেকটি নাগরিক যেন ঘুম থেকে সজাগ হয়ে উঠল। রিক্ত, বিড়ম্বিত, হতাশাগ্রস্ত, অর্ধমৃত কওম যেন চোখের নিমিষেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল।

পাকিস্তানের বুকে জনগণের অধিকার ও সম্মান স্বীকৃতি লাভ করল।

তিনি গোটা কওমকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন।

তবে সদর আইয়ুবের কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখা দরকার। কারণ তারই গণতন্ত্র-প্রীতির ফলে—তা যে ধরণের হোক না কেন—রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের অধিকার দেশবাসী ফিরে পেয়েছে। এটাও মামুলী কথা নয় মোটেই।

কিন্তু একথাও সত্য যে সমগ্র পাকিস্তানে একমাত্র মাদারে মিল্লাত ব্যতীত আর কারুর ব্যক্তিত্ব এমন নেই—যিনি গোটা জাতিকে এভাবে প্রাণ চঞ্চল করে তুলতে পারেন। আর কোনও ব্যক্তিত্বে তেমন আকর্ষণ শক্তি নেই—যাঁর ইশারায় খঞ্জ, পংগু, বোবা কওম এভাবে কর্ম চঞ্চল হয়ে উঠতে পারত কোনও দিন। আল্লাহ তায়ালার অপার মেহেরবানী—তাই কায়েদে আজমের ইন্তেকালের সুদীর্ঘ ষোল বছর পরে সেই বিরাট দায়িত্ব কায়েদে আজমের বোনের কাঁধেই ন্যস্ত করলেন—যেন তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত, রিক্ত, বিড়ম্বিত, হতাশা-গ্রস্ত, দুর্বল কওমের অন্তরে জীবনের ও আত্মসম্মান বোধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেন।

এবারের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ফলাফল সামনে রেখে সবাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন :

যে বিপুল ও সর্বগ্রাসী কঠোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, তাতে গণতন্ত্রের শিবির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারই কথা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি :

মাদারে মিল্লাতের বদৌলতে পাকিস্তানের বুকে প্রায় ৩০ হাজার এমন বীর সেনানী আমরা পেয়েছি—যারা গণতন্ত্রের জন্য বলতে গেলে সব কিছুই বিসর্জন দিয়েছেন—কোন কিছুর মোহে নয়, বরং আদর্শের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য।

সত্য বলতে কি! পাকিস্তানের ইতিহাসে গণতন্ত্রের শিবির এতখানি মজবুত আর কোনও দিন ছিল না।

ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়

সম্মিলিত বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে মাদারে মিল্লাত আমাদের সামনে ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় তুলে ধরলেন।

মাদারে মিল্লাত সকাশে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট কতিপয় নেতৃবৃন্দ। জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল, জনাব সৈয়দ খাজা খায়রুদ্দীন এম, এন, এ, মহিদুর রহমান চৌধুরী (চট্টগ্রাম), জনাব শওকত হায়াত, জনাব শফিকুল ইসলাম, প্রিন্সেস আবিদা সুলতানা, জনাব নওয়াজেশ আহমদ, জনাব শাহেদ আলী এডভোকেট (সিলেট) ও জনাব নূরুল ইসলাম এম, পি, এ (কুমিল্লা) প্রমুখ দেখা যাইতেছে।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতমাশের সন্তানদের মধ্যে রাজিয়া সুলতানা যদিও সব চাইতে যোগ্যতাসম্পন্না ছিলেন, কিন্তু যুগযুগান্তের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোটারী দল কিছুতেই তাকে বরদাশত করতে রাজী হল না।

উদারচেতা হিসেবে সম্রাট আকবর যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি চাঁদ বিবির অস্তিত্ব বরদাশ্ত করতে রাজী হন নি।

পক্ষান্তরে সম্রাট আওরংগজেব ধর্মীয় সংকীর্ণতার কুখ্যাতি (?) অর্জন করা সত্ত্বেও আফগানিস্তানের গবর্ণর পদে একজন মহিলাকেই নিয়োগ করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের রাণী বোডিসিয়া (BOADICEA) রোমানদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে আজাদী-সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন।

মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর উত্তর আফ্রিকা অভিযানকালে সেখানকার বারবার জাতি জনৈকা বীর মহিলার নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল।

উনিশ শতকে—ফরাসীদের বিরুদ্ধে যখন আলজিরিয়ার জনগণ জেহাদ ঘোষণা করেন, তখন এক ফাতেমাই তাদেরকে নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

বিশ শতকে—

খালেদা আদিব খানম, সরোজিনী নাইডু, সান-ইয়াত-সান প্রমুখ কীর্তিমান মহিলাদের কথা গর্বের সাথে আমরা স্মরণ করি। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারিণী হলেন—সিংহলের মিসেস বান্দা নায়েকা।

ইনিই বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে এশিয়া ও আফ্রিকা খুবই অনুন্নত এলাকা। কিন্তু রাজ-বংশীয় মহিলা রাষ্ট্র-প্রধানদের কথা বাদ

দিলে ইয়োরোপ আমেরিকার কোথাও আজ পর্যন্ত কোনও মহিলাকে প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্র-প্রধান পদে নির্বাচিত করা হয় নি। নির্বাচিত হওয়া ত দূরের কথা—নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নজীরও পাওয়া যায় না।

তা-ই ত মাদারে মিল্লাতের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সারা বিশ্বের দৃষ্টি পাকিস্তানের দিকে আরেকবার আকৃষ্ট হয়েছে।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই নূতন গৌরবময় অধ্যায়ে থাকবে :

গণতন্ত্র ও গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার
সংগ্রাম সাধনার অমর কাহিনী।

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—মাদারে মিল্লাত ও গণতন্ত্রের বীর বাহাদুর সেনানীদেরকে সশ্রদ্ধ সালাম-অভিবাদন পেশ করা :

মাদারে মিল্লাত জিন্দাবাদ।
গণতন্ত্র জিন্দাবাদ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ।